shaibalrony@yahoo.com

সকল কাঁটা ধন্য করে

হুমায়ূন আহমেদ

www.banglabook.com

কাকলী প্রকাশনী

©
গুলতেকিন আহমেদ

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

দ্বিতীয় প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
নৃশা কম্পিউটার্স
৩৪ আজিমপুর সুপার মার্কেট
ঢাকা ১২০৫

মুদ্রণ
এস. আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামা প্রসাদ চৌধুরী লেন
ঢাকা — ১১০০

দাম ৬০ টাকা

ISBN 984 437 079 5

উৎসর্গ
কবি ফরহাদ মজহার
প্রিয়বরেষু

কবি-মানুষও যে রাজনীতি নিয়ে
জটিল জটিল প্রবন্ধ লিখে সবাইকে
চমকে দিতে পারে — আমার ধারণা
ছিল না।

www.banglabook.com

লেখকদের কাছ থেকে লেখা আদায়ের অনেক রকম পদ্ধতি আছে। সবচে' নিম্ন শ্রেণীর পদ্ধতিটি হল — গলায় গামছা বেঁধে লেখা আদায়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমার কবি-বন্ধু হাসান হাফিজ 'সকল কাঁটা ধন্য করে'র লেখাগুলি আমাকে দিয়ে লিখিয়েছেন। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে ভেবেছি, বড় একটা ডাণ্ডা দিয়ে হাসান হাফিজের মাথায় শক্ত বাড়ি দেই। তারপর থানা পুলিশ যা হবার হবে।

বই আকারে বের করার আগে লেখাগুলি পড়তে গিয়ে ভাল লাগল। মনে হল হাসান হাফিজকে সাময়িকভাবে ক্ষমা করা যায়।

আমি এর আগে কোন একটি বই-এ লিখেছিলাম — আত্মকথা জাতীয় লেখা আর লিখব না। এই বইটিতে কিছু সে রকম রচনা ঢুকে গেছে। পাঠক-পাঠিকারা আমার সে কথা না রাখার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন — এই প্রার্থনা। বলতে ভুলে গেছি এই গ্রন্থের বেশিরভাগ লেখাই আমার প্রিয় পত্রিকা দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদ
১২. ১২. ৯৪
সমুদ্র বিলাস
সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড

www.banglabook.com

Each one sees what he carries in his heart
— Goethe

শিকড়	৯
লোভ	১২
বাউলা কে বানাইলরে	১৫
তিনি	১৯
প্রিয় পশু	২৩
একদিন চলিয়া যাব	২৭
খেলা	৩০
জাপানী কৈ মাছ	৩৪
পোট্রেট	৩৭
মৃত্যু	৪০
ধন্য জন্মেছি এই দেশে	৪৪
ভূতের পা	৪৭
সমুদ্র বিলাস	৫১
এই দিনতো দিন নয়	৫৫
প্রিয় হক ভাই	৫৮
ফুটবল ও আমরা	৬১
অন্যরকম উৎসব	৬৪
কচ্ছপের গল্প	৬৭
ছেলেটা	৭০
একালের শবেবরাত	৭৩
আমরা কোথায় চলেছি?	৭৬
আমার বাবার জুতা	৭৯
গ্রীন বয়েজ ফুটবল ক্লাব	৮৩
আমার বন্ধুরা	৮৬
ছুনু মিয়া	৮৯
আঙুল	৯৬

কাকলী কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

দ্বৈরথ
হোটেল গ্রেভার ইন
সমুদ্রবিলাস
গৌরীপুর জংশন
আমার ছেলেবেলা
ভূত ভূতং ভূতৌ
নি
স্বনির্বাচিত উপন্যাস
কোথাও কেউ নেই
জনম জনম
কিশোর সমগ্র
তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে
অনন্ত নক্ষত্র বিথী
কোয়ান্টাম রসায়ন
এই আমি
আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই

শিকড়

মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকা শহরে খাট, মিটসেফ, চেয়ার-টেবিল এবং লেপ-তোষক বোঝাই করে কিছু ঠেলাগাড়ি চলাচল করে। ঠেলাগাড়ির পেছনে পেছনে একটা রিকশায় বসে থাকেন এইসব মালামালের মালিক। তাঁর কোলে থাকে চাদরে মোড়া বার ইঞ্চি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি কিংবা টু-ইন-ওয়ান। তাঁকে খুবই ক্লান্ত ও উদ্বিগ্ন মনে হয়, কারণ একইসঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে ঠেলাগাড়ির দিকে এবং তাঁর কোলে বসানো পরিবারের সবচে' মূল্যবান সামগ্রীটির দিকে। তাঁকে খুব অসহায়ও মনে হয়। অসহায়, কারণ এই মুহূর্তে তাঁর কোন শিকড় নেই। শিকড় গেড়ে কোথাও না বসা পর্যন্ত তাঁর অসহায় ভাব দূর হবে না।

মানুষের সঙ্গে গাছের অনেক মিল আছে। সবচে' বড় মিল হল, গাছের মত মানুষেরও শিকড় আছে। শিকড় উপড়ে ফেললে গাছের মৃত্যু হয়, মানুষেরও এক ধরনের মৃত্যু হয়। মানুষের নিয়তি হচ্ছে তাকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যুর ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয় চূড়ান্ত মৃত্যুর দিকে।

শিকড় ছড়িয়ে দেবার জন্যে গাছের অনেক কিছু লাগে – নরম মাটি, পানি, আলো, হাওয়া। মানুষের কিছুই লাগে না। কয়েকটা দিন একটা জায়গায় থাকতে পারলেই হল, সে শিকড় গজিয়ে ফেলবে এবং অবধারিতভাবে শিকড় উপড়ানোর তীব্র যাতনায় এক সময় কাতর হবে। দৃশ্যটা কেমন? একটা পরিবারের কথাই মনে করা যাক। ধরা যাক, এরা চার-পাঁচ বছর একটা ভাড়া বাড়িতে থেকেছে। বাড়িওয়ালা, বাড়িওয়ালাদের স্বভাবমত এদের নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে। ঠিকমত পানি দেয়নি। বাড়িভাড়া বাড়িয়েছে দফায় দফায়, শেষ পর্যন্ত নোটিশ দিয়েছে বাড়ি ছাড়ার। এরা বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। নতুন একটা বাড়ি পেয়েছে, যেটা এই বাড়ির চেয়েও সুন্দর। ভাড়া কম, সামনে খানিকটা খোলা জায়গাও আছে। পরিবারের সবাই এমন ভাব দেখাচ্ছে যে, এই পচা বাড়ি ছেড়ে দিতে পেরে তারা খুবই আনন্দিত। কিন্তু পরিবারের কর্ত্রী মনের কষ্ট পুরোপুরি ঢাকতে পারছেন না। বারবারই তাঁর মনে হচ্ছে, এই বাড়ি ঘিরে কত আনন্দ-বেদনার স্মৃতি।

তাঁর বড় ছেলের জন্ম হলো এই বাড়িতে। এই বাড়িতেই তো সে হাঁটতে শিখল। টুকটুক করে হাঁটতো, একবার সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে কি প্রচণ্ড ব্যথাই না পেল। প্রথম কথা শিখে পাখি দেখে উত্তেজিত গলায় বলেছিল, পা . . . পা . . . পা . . .

তিনি বাঁধাছাঁদা করছেন, পুরোনো সব কথা মনে পড়ছে আর চোখ মুছছেন। জিনিসপত্র সরাতে গিয়ে বাবুর ছ'মাস বয়সের একটি জুতা পেয়ে গেলেন। বাবু বেঁচে নেই, তার সব জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মৃতের কিছু জমা করে রাখতে নেই। কিন্তু তার একপাটি জুতা কিভাবে থেকে গেল? এই জুতায় এখনো বাবুর গায়ের গন্ধ।

তিনি ঘর গোছানো বন্ধ রেখে স্বামীকে নিচু গলায় বললেন, কিছু বেশি ভাড়া দিয়ে থেকে গেলে কেমন হয়? স্বামী খুব রাগ করলেন। কি আছে এই বাড়িতে যে এখানেই থাকতে হবে? এ বাড়ি নরক ছাড়া আর কি? নচ্ছার বাড়িওয়ালা। বাসা ছোট। আলো নেই, বাতাস নেই।

যেদিন বাসা বদল হবে সেদিন ছোট বাচ্চা দুটা কাঁদতে লাগলো। তারা এই বাসা ছেড়ে যাবে না। বাবা হুংকার দিলেন, খবরদার, নাকি কান্না না। এরচে' হাজার গুণ ভাল বাসায় তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি।

বাবা জিনিসপত্র ঠেলাগাড়িতে তুলে বাসার চাবি বাড়িওয়ালাকে দিতে গেলেন। চাবি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়িতে তাঁর প্রোথিত শিকড় ছিঁড়ে গেল। তীব্র কষ্টে তিনি অভিভূত হলেন। তাঁর চোখে পানি এসে গেল। নতুন বাসার জন্যে এডভান্স টাকা দেয়া হয়ে গেছে। তাঁর মত দরিদ্র মানুষের জন্যে অনেকগুলি টাকা। তারপরেও তিনি বাড়িওয়ালাকে বললেন, ভাই সাহেব, ছেলেমেয়েরা এই বাসা ছাড়তে চাচ্ছে না। চারদিকে পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা তো . . . আচ্ছা না হয় পাঁচশ' টাকা বেশিই দেব . . . তাছাড়া ইয়ে, মানে আমার বড় ছেলে এই বাড়িতেই জন্মাল, আমার স্ত্রী মানে মেয়েমানুষ তো, ইমোশনাল, বুঝতেই পারছেন না . . . ছেলের স্মৃতি . . .

বাড়িওয়ালা রাজি হলেন না। বাবা ভেজা চোখে ছোট্ট টিভিটা কোলে নিয়ে রিকশায় উঠে বসলেন।

অনেকদিন ধরেই আমি এই শহরে আছি। কতবার বাসা বদলালাম। প্রতিবারই এই কাণ্ড। বছরখানিক আগে শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটরের বাসাটা ছাড়লাম। অনেকদিন সেখানে ছিলাম। কত সুখস্মৃতি! বাসার সামনেটা গাছগাছালিতে ছাওয়া। গাছে বাসা বেঁধেছে টিয়া। একটি দু'টি না — হাজার হাজার। বারান্দায় বসে দেখতাম, সন্ধ্যা হলেই ঝাঁক বেঁধে টিয়া উড়তো। আমার মেয়েরা গাছের নিচে ঘুরঘুর করতো টিয়া পাখির পালকের জন্যে। এরা পাখির পালক জমাতো।

হলের সঙ্গেই কি বিশাল দীঘি! কি পরিষ্কার টলটলে পানি! বাঁধানো ঘাট। কত জোছনার ফিনকি ফোটা রাতে আমি আমার ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে নেমে গেছি দীঘিতে। এই দীঘিতেই তো বড় মেয়েকে সাঁতার শেখালাম। প্রথম সাঁতার শিখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমার মেয়ে একা একা মাঝ পুকুরের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ভয় পেয়ে ফিরে এল। কি সুন্দর দৃশ্য!

হলের সামনের মাঠে আমার তিন কন্যা সাইকেল চালাতে শিখলো, আমি তাদের

ইন্সট্রাকটার। সাইকেল নিয়ে প্রথমবারের মত নিজে নিজে কিছু দূর এগিয়ে যাবার আনন্দের কি কোন সীমা আছে? না নেই। এই আনন্দ আকাশ থেকে প্যারাট্রুপারের প্রথম ঝাঁপ দেয়ার আনন্দের মত। আমার কন্যাদের আনন্দের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে এই হল।

হলের বাসার টানা বারান্দায় বসে রাত জেগে কত লেখালেখি করেছি। গুলির শব্দে মাঝে মাঝে লেখায় যেমন বাধা পড়েছে তেমনি অন্যরকম ব্যাপারও ঘটেছে। হঠাৎ শোনা গেল — বাঁশি বাজছে। কাঁচা হাতের বাজনা না, বড়ই সুন্দর হাত। লেখালেখি বন্ধ করে বাঁশি শুনেছি।

আমার হলের নিশিরাতের সেই বংশীবাদক জানে না আমি কত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতাম তার বাঁশির জন্যে। সে ভাল থাকুক, তার জীবন মঙ্গলময় হোক — এই প্রার্থনা। কত আনন্দ পেয়েছি তার জন্যে!

সেই হল ছেড়ে দেবার সময় হল। বহু দূর প্রোথিত এই শিকড় ছিঁড়তে হবে।

কি কষ্ট! কি কষ্ট!!

ঠিক করলাম, একদিনে হল ছেড়ে যাব না। ধীরে ধীরে যাব। প্রথম দিন হয়তো বইগুলি নেয়া হবে, দ্বিতীয় দিনে শুধু চেয়ার, তৃতীয় দিনে ফুলের টব . . . এইভাবে এক মাসের পরিকল্পনা। বোঝাও যাবে না আমরা হল ছাড়ছি। করাও হল তাই। বাচ্চাদের আগে আগে পাঠিয়ে দেয়া হল। আমি এবং আমার স্ত্রী হল ছাড়লাম এক গভীর রাতে।

শেষবারের মত শূন্য ঘরে দাঁড়িয়েছি। ছোট বাচ্চাদের মত ফুঁপিয়ে কাঁদছি, গুলতেকিন বলল, তোমরা যখন এত খারাপ লাগছে তখন হল ছেড়ে দিচ্ছ কেন? থেকে যাও।

থেকে যাও বললেই থেকে যাওয়া যায় না। প্রোথিত শিকড় ছিঁড়তে হয়। হয়ত এই শিকড় ছেঁড়ার মধ্য দিয়েই কেউ একজন আমাদের আসল শিকড় ছেঁড়ার কথা মনে করিয়ে দেন . . .

লোভ

ভদ্রলোক চেইন স্মোকার।

চেইন স্মোকারের যে অভ্যাস, একটা সিগারেট পুরোপুরি শেষ না করেই অন্য একটা ধরাচ্ছেন। ভদ্রলোককে ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হল না। কেমন অস্থির ভাবভঙ্গি। কিছুক্ষণ পর পর জিব দিয়ে ঠোঁট ভেজাচ্ছেন। মাথা চুলকাচ্ছেন।

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি চাপা গলায় বললেন, আমার একটাই মেয়ে। তার নাম 'আনান'। আপনি কি 'আনান' শব্দটার মানে জানেন?

'জ্বি-না।'

'আনান শব্দের মানে হল মেঘ। আমি ডাকতাম মেঘবতী।'

'ডাকলাম বলতেন কেন? মেয়েটি কি বেঁচে নেই?'

জ্বি-না। সেই গল্পটাই বলতে এসেছি। লেখকরা সাইকিয়াট্রিস্টের মত। তাদের কাছে কথা বললে মন হালকা হয়। মেঘবতীর গল্প আপনাকে বলব?'

'বলুন।'

'আমি বেশি সময় নেব না। ধরুন দশ মিনিট। দশ মিনিটে গল্প শেষ করে চলে যাব।'

ভদ্রলোক আরেকটা সিগারেট ধরালেন। আমি দুঃখময় গল্প শোনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিলাম। ছুটির দিনে ভোরবেলায় কষ্টের গল্প শুনতে ভাল লাগে না — ভদ্রলোককে তা বলা যাবে না। তিনি তাঁর মেঘবতীর গল্প বলে মন হালকা করতে এসেছেন।

'মেয়েটার লিউকেমিয়া হয়েছিল।'

'আপনার কি একটাই মেয়ে?'

'জ্বি একটাই। ওর লিউকেমিয়া হয়েছে শুনে আমার মাথা খারাপের মত হয়ে গেল। যে ডাক্তার বললেন, ইচ্ছা করছিল গলা চেপে ধরে তাঁকেমেরে ফেলি। আমি বোধহয় আমার মনের ভাব আপনাকে বুঝাতে পারছি না। আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না।'

'আপনি বেশ গুছিয়েই কথা বলছেন।'

'ডাক্তার আমাকে বললেন মেয়েকে বোম্বের ক্যান্সার হাসপাতালে নিয়ে যেতে। হিসেব করে দেখি তিন লাখ টাকার মত লাগে। কোথায় পাব তিন লাখ টাকা? আমি নিম্ন-মধ্যবিত্তের একজন। নিম্ন-মধ্যবিত্তের সহায় বলতে বিয়ের সময় স্ত্রী সঙ্গে করে যা সামান্য গয়না আনেন — তা। কত আয় হবে গয়না বিক্রি করে! তবু রুমালে বেঁধে সব গয়না একদিন বিক্রি করতে নিয়ে গেলাম। মাত্র তেইশ হাজার টাকা হল। আর টাকা কোথায় পাই? কার কাছে যাব ধার করতে? পত্রিকায় মেয়ের ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দিতে

পারি। "মৃত্যু পথযাত্রী মেঘবতীর জীবন রক্ষায় সাহায্য করুন।" সেই অপমান, সেই লজ্জাও মৃত্যুসম। কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। তখন একটা ব্যাপার হল। আন্দাজ করুন তো মজার ব্যাপারটা কি?'

'আন্দাজ করতে পারছি না। আপনিই বলুন।'

'মেয়ে মারা যাচ্ছে — মেয়ের জন্যে স্ত্রীর গয়না-টয়না সব বিক্রি করেছি এই খবরটা জানাজানি হয়ে গেল। সাহায্য আসতে শুরু করল এমন সব জায়গা থেকে যে কল্পনাও করিনি। মেয়ে যে স্কুলে পড়ত সেই স্কুলের হেডমিসট্রেস একদিন এসে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেলেন। স্কুলের মেয়েদের কাছ থেকে চাঁদা তুলেছেন। তার দু'দিন পর মেয়ে যে ক্লাসে পড়ে সেই ক্লাসের একটি মেয়ে তার বাবাকে নিয়ে উপস্থিত। ভদ্রলোককে চিনি না, জানি না। তিনি এক লক্ষ টাকার একটা চেক নিয়ে এসেছেন। আমি আনন্দে কেঁদে ফেললাম। আমার কান্না দেখে মেয়েও কাঁদতে লাগল। নাটকের ক্রন্দন-দৃশ্যের মত রীতিমত ক্রন্দন-দৃশ্য।

একদিন আমার অফিসের কলিগরা এলেন। তাঁরা এক দিনের বেতন নিয়ে এলেন। আমার আত্মীয়স্বজনরা টাকা নিয়ে আসতে শুরু করলেন। ভয়ংকর কৃপণ বলে যাকে জানতাম, যার হাত দিয়ে এলুমিনিয়ামের দশ পয়সাও গড়িয়ে পড়ে যায় না — তিনি এলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে। আমার এক প্রতিবেশী, যার অবস্থা আমার মতই, তিনি পর্যন্ত এসে আমার স্ত্রীর হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গেলেন। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

যাঁরা অর্থ সাহায্য করতে পারলেন না তাঁরা এগিয়ে এলেন বুদ্ধি ও পরামর্শ নিয়ে। তাঁদের বুদ্ধিতেই আমি বিভিন্ন এনজিও-র কাছে চিঠি লিখলাম। সাহায্য চেয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এইসব বড় বড় মানুষের কাছে চিঠি লিখলাম। "সেভ দি চিলড্রেন"-এ লিখলাম। চিঠি লিখলাম আমাদের দেশের মন্ত্রীদের কাছে — কেউ বাদ পড়ল না। এমন কি একটা চিঠি পাঠানো হল কোলকাতায় মাদার তেরেসার কাছে।

চিঠির উত্তর আসতে শুরু করল। বেশিরভাগই মেয়ের জন্যে শুভ কামনা এবং আর্থিক সাহায্যের বিধান নেই বলে দুঃখ প্রার্থনা ; তবে তাদের মধ্যেও কেউ কেউ চেক পাঠালেন। মোটা অংকের চেক। একটা চেক ছিল পাঁচ হাজার পাউণ্ডের।

একদিন টাকাপয়সা হিসেব করে দেখি চৌদ্দ লাখ সত্তর হাজার টাকা জমা হয়েছে। তখন লোভ নামক ব্যাপারটা আমার মধ্যে দেখা দিল। মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল — আরো কিছু টাকা জোগাড় করা যাক। আরো কিছু। স্ত্রীকে বললাম, এই টাকায় হবে না — মেয়েকে আমি আমেরিকায় নিয়ে যাব। মিনিমাম কুড়ি লাখ টাকা আমার দরকার। সাহায্য চেয়ে, ছবি দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবার ব্যাপারে আমার যে প্রচণ্ড দ্বিধা ছিল সেটা কেটে গেল। আমি সব পত্রিকায় মেয়ের ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দিলাম।

টিভির একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে মেয়েকে নিয়ে গেলাম। উপস্থাপক সেই

অনুষ্ঠানে মেয়েটির জীবন রক্ষার জন্যে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার অনুরোধ জানালেন। সেই অনুষ্ঠানে আমার মেয়ে একটা গান গাইল —

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে . . . "

আপনি কি অনুষ্ঠানটি দেখেছিলেন?'

'জ্বি-না।'

'অনেকেই দেখেছেন। অনুষ্ঠানটির কারণে আমার জন্য অর্থ সংগ্রহ সহজ হয়ে গেল। দেশে কোন বড়লোকদের কাছে টাকার জন্যে যখন যাই — কিছুক্ষণ কথা বলার পরই তাঁরা বলেন — ও আচ্ছা, বড় বড় চোখের মেয়েটি যে গান গাইল — আমরা সবাই রাজা ? . . . আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি স্যাড। আপনি বসুন, আপনাকে একটা চেক লিখে দিচ্ছি . . .

একুশ লক্ষ টাকা জমিয়ে ফেললাম এক মাসের মধ্যে।'

'একুশ লক্ষ টাকা?'

'সামান্য কম, তবে একুশ লক্ষ ধরতে পারেন। বাংলাদেশ বিমান দিল দু'জনের বোম্বে যাবার ফ্রি টিকেট। বোম্বে অবশ্যি যাওয়া হল না — মেয়েটা তার আগেই মারা গেল।'

ভদ্রলোক সিগারেট ধরালেন। কোন কথা না বলে অনেকক্ষণ সিগারেট টানলেন। ঘড়ি দেখলেন। তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন — আপনার দশ মিনিট সময় নেব বলেছিলাম, পনের মিনিট নিয়ে ফেলেছি। দয়া করে ক্ষমা করবেন। গল্পটা শেষ করেছি। এখন চলে যাব। গল্পের শেষটা বলা হয়নি — শেষটা হচ্ছে — আমার একাউন্টে এখন বাইশ লক্ষ টাকার মত আছে। ইন্টারেস্ট জমা হচ্ছে, টাকা বাড়ছে। মাঝে মাঝে ভাবি — টাকাটা কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করি, কোন সেবা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেই। দিতে পারি না। লোভ আমাকে বাধা দেয়। আবার নিজেও খরচ করতে পারি না। অদ্ভুত একটা অবস্থা। এখন আমার কাজ কি জানেন? কাজ হচ্ছে প্রতি মাসে গিয়ে ব্যাংকে খোঁজ নেয়া — ইন্টারেস্ট কত হয়েছে। তিশ বছর পর কুড়ি লক্ষ টাকা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে কত হবে জানতে চান? বলব?

বাউলা কে বানাইলরে

তিনি ছিলেন একজন ছোটখাট রাজা, অসম্ভব ক্ষমতাবান এক সামন্ত প্রভু। সামন্ত প্রভুদের অনেক বিচিত্র স্বভাব থাকে, তাঁরও ছিল। গভীর রাতে তিনি রূপবতী সঙ্গিনীদের নিয়ে বজরায় উঠতেন। বজরা নিয়ে যাওয়া হত মাঝ হাওড়ে। যেন আশপাশে কেউ না থাকে। যেন তাঁর বিচিত্র নিশিযাপন কেউ বুঝতে না পারে। শুরু হত গান। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর সঙ্গিনীদের বলতেন নাচতে। শুরু হত নাচ। প্রবল তামসিক জীবন। শুধু ভোগ, শুধুই আনন্দ। এই তামসিক জীবন যিনি যাপন করে গেছেন তাঁর নাম হাসন রাজা। ভয়াবহ তৃষ্ণা নিয়ে জীবনকে তিনি পান করেছেন। তারপরেও তৃষ্ণা মেটে না। ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে গেয়েছেন, বাউলা কে বানাইলরে, হাসন রাজারে?

হাসন রাজার প্রপৌত্র কবি মমিনুল মউজদীন আমাকে সুনামগঞ্জে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। সুনামগঞ্জের মানুষ হাসন রাজাকে নিয়ে উৎসব করছেন। রাতভর তাঁরা শোনাবেন হাসন রাজার গান। কবি মমিনুল চাচ্ছেন আমি যেন সেই উৎসবে থাকি। একবার ভাবলাম, যাব না। উৎসব মানেই হৈ-চৈ। তাছাড়া আমাকে সেখানে নিশ্চয়ই বক্তৃতাও দিতে হবে। কি বলব আমি? হাসন রাজার গান শুনেছি — এই পর্যন্তই। আর কিছুই জানি না। বক্তৃতা দেয়ার জন্যে বিদগ্ধ বক্তারা তো থাকবেনই। তাঁরা মিসটিক কবি সম্পর্কে অনেক কিছু বলবেন। শুরুটা হবে মিসটিক শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকে। গ্রীক কোন্ শব্দ থেকে এসেছে, এর সাধারণ মানে কি, আবার অসাধারণ মানে কি? দার্শনিক হিসেবে হাসন রাজার শ্রেণীভেদ করা হবে। তাঁর সহজ প্রেমের গানগুলি যে আসলে আধ্যাত্মিক গান, তা কঠিন সব যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হবে। ১৯৩১ সনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে **The Religion of Man** প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হাসন রাজার গান বিষয়ে কি বলেছিলেন তা বলা হবে। হংসসম এই সব পণ্ডিত বক্তাদের মাঝে আমি তো দলছুট 'বক'। আমি কি করব?

খোলা মাঠে বসে রাতভর গান শুনতে পাব, খাঁটি গান। টিভি-রেডিও আর্টিস্ট শহুরে বাউলদের গান না, আসল গান। সেই আকর্ষণ অগ্রাহ্য করা কঠিন। তার উপর আছে হাসন রাজার বাড়ি দেখার লোভনীয় প্রস্তাব। যে বাড়ি নিয়ে তিনি লিখলেন, 'ঘরবাড়ি ভালা না আমার।'

সমস্যা হল শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। সামনে ফেব্রুয়ারির বইমেলা। অনেককে নতুন বই দেব বলে রেখেছি। একটি পাণ্ডুলিপিও শেষ করতে পারিনি। যখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি, তখন আমি সাহায্যের জন্যে যাই দৈনিক বাংলার সালেহ ভাইয়ের কাছে। তিনি নিজেও হাসন মেলায় যাচ্ছেন। আমার সমস্যাটা তিনি ভালই

জানেন। সালেহ ভাই অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, অসম্ভব, তোমার যাওয়াটা ঠিক হবে না। তুমি লেখালেখি করো।

'আপনারা মজা করে গান শুনবেন, আর আমি লেখালেখি করব?'

'হ্যাঁ। প্রায়োরিটি বলে একটা কথা আছে। তোমার প্রথম প্রায়োরিটি হল লেখালেখি। দ্বিতীয় প্রায়োরিটি খোলা মাঠে গান শোনা। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'যখন তোমার লেখালেখির চাপ থাকবে না তখন তোমাকে হাসন রাজার বাড়ি দেখিয়ে আনব।'

সালেহ ভাই আমাকে ফেলে সুনামগঞ্জ চলে গেলেন। আমার মন খারাপ হল। এবং মন খারাপ ভাব দূর করার জন্যে পরের রাতে সুনামগঞ্জের উদ্দেশে ট্রেনে চেপে বসলাম। একা না, প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি কবি হাসান হাফিজকে। সফরসঙ্গী হিসেবে কবিরা মোটেই সুবিধার হন না। তাঁরা অকারণে ভাব ধরে ফেলেন। তবে হাসান হাফিজ ব্যতিক্রম। কবি হলেও তাঁর হাবভাব গদ্যকারের মত। ট্রেন ছাড়া মাত্র তিনি পকেট থেকে মার্লবোরো সিগারেট বের করে বললেন, মরমী কবি হাসন রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে আমরা এখন থেকে মার্কিন সিগারেট খাব। এবং ক্রমাগত হাসন রাজার গান গাইতে থাকব।

আমরা কেউই গান জানি না। তরুণ গায়ক সেলিম যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে। তাকে ধরে আনা হল। আমি বললাম, এখন থেকে ননস্টপ হাসন রাজার গান চলবে। শুরু কর। সেলিম সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলো,

নিশা লাগিলরে
বাঁকা দুই নয়নে নিশা লাগিলরে।
হাসন রাজা পিয়ারীর প্রেমে মজিলরে . . .

আমি চমকে উঠলাম। কারণ এই গান নিয়ে আমার কিছু সুখ-স্মৃতি আছে।

কয়েক বছর আগে দেওয়ান গোলাম মোর্তজার স্মৃতি-উৎসবে যোগ দেবার জন্যে হবিগঞ্জ গিয়েছিলাম। থাকি সার্কিট হাউসে। রাত জেগে গল্পগুজব হয় বলে বেলা করে ঘুম ভাঙে। সেদিন কি যে হলো, সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে আমিও জেগে উঠলাম। প্রভাতের সূর্য দেখে আমি অবাক। সূর্যও সম্ভবত আমাকে দেখে অবাক। সকাল এত সুন্দর হয় কে জানতো! আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালার ওপাশে সকাল হওয়া দেখছি। আমার জন্যে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। দরজা খুলে বারান্দায় এসে দেখি এই কাক-ডাকা ভোরে মায়াবী চোহারার এক তরুণী আমার ঘরের দরজার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, কি ব্যাপার?

তরুণী ক্ষীণ গলায় জানালো, সে আমার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এসেছে। ঘরে

বানানো সন্দেশ। আমাকে সামনে বসিয়ে খাওয়াবে। তারপর একটা গান শোনাবে। সে আমাকে বিরক্ত করবে না। গানটা শুনিয়েই চলে যাবে। বলাই বাহুল্য, আমি অভিভূত হলাম। সকাল বেলায় আমি মিষ্টি খেতে পারি না। তারপরেও তিনটা সন্দেশ খেয়ে ফেললাম। বললাম, এখন গান শোনাও। সে কিন্নর কণ্ঠে গান ধরলো,

নেশা লাগিলরে
বাঁকা দুই নয়নে নেশা লাগিলরে।
হাসন রাজা পিয়ারীর প্রেমে মজিলরে।

গাইতে গাইতে মেয়েটির চোখে পানি এসে গেল। সে চোখ মুছতে মুছতে বলল, এটা হাসন রাজার একমাত্র প্রেমের গান। আমার খুব প্রিয়। আমি যতবারই গাই, ততবারই কাঁদি। আপনি যদি আপনার কোন নাটকে গানটা ব্যবহার করেন, আমার খুব ভাল লাগবে।

এর পরপরই আমি 'অচিন বৃক্ষ' নামে একটা টিভি নাটক লিখি। সেখানে হতদরিদ্র প্রাইমারী স্কুলের এক মাস্টার সাহেবের অসুস্থ স্ত্রী এই গানটি করেন। গানটা যখন টিভিতে রেকর্ড করা হচ্ছে, তখন আমি অবাক হয়ে দেখি, আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সেই দিনই মনে মনে ঠিক করি, হাসান রাজার সব গান শুনব। ক্যাসেটের দোকানে দোকানে ক'দিন খুব ঘুরলাম। অনেকে হাসন রাজার নামও শোনেনি। অল্প কিছু গান পাওয়া যায় — 'লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ী ভালা না আমার', 'মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী হইয়া রে'। গাতক কাউকে পেলেই জিজ্ঞেস করি, হাসন রাজার গান জানেন?

বেশির ভাগ সময়ই উত্তর শুনি, না।

একদিন এক বাউল আমাকে চমকে দিয়ে গাইলেন, 'আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপ রে।' আমার চমকাবার কারণ হচ্ছে, এই গান আমি আমেরিকায় শুনেছি। বিখ্যাত একটা গান — 'Close your eyes and try to see'.

কবি চোখ বন্ধ করে দেখতে বলছেন। আর হাসন রাজা বলছেন, চোখ বন্ধ করে রূপ দেখতে। কি সুন্দর কথা! কি অপূর্ব বাণী!

গভীর আবেগ ও গভীর ভালবাসায় হাসন রাজার দেশে পা রাখলাম। উৎসব প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসেছে গান শুনতে। হাসন রাজা তাদের ভালবেসেছিলেন। তারা সেই ভালবাসা ফেরত দিতে চায়।

সভাতে আমাকে বলা হল, হাসন রাজাকে নিয়ে একটা নাটক লিখতে। আমি বললাম, অবশ্যই আমি এই কবির বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে একটা নাটক লিখব।

সভা শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমে এসেছি। স্থানীয় এক ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে

আড়ালে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'উনাকে নিয়ে আপনি নাটক লিখবেন? আপনি কি জানেন উনি লম্পট ছিলেন?

আমি বললাম, 'জানি। হাসন রাজা নিজেই তাঁর গানে লিখে রেখে গেছেন। না জেনে উপায় কি?'

'হাসন রাজা নিজে বলেছেন তিনি লম্পট?'

'হ্যাঁ, গানটা হল, 'সর্বলোকে জানে হাসন রাজায় লম্পটিয়া।'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। আমি বললাম, 'হাসন রাজার মত আরো কিছু লম্পট থাকলে কত ভাল হত, তাই না ভাই?'

রাত দু'টোর দিকে বিরাট দলবল নিয়ে আমরা হাসন রাজার কবর দেখতে গেলাম। গান গাইতে গাইতে যাচ্ছি — বাউলা কে বানাইলরে?

কবরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। কবরের গায়ে লেখা —

লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি ভালা না আমার
কি ঘর বানাইব আমি শূন্যের মাঝার।

আমি মনে মনে বললাম, হাসন রাজা, আমার গভীর ভালবাসা তোমাকে জানানোর জন্যে আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমার ভালবাসা গ্রহণ কর। তোমাকে যিনি বাউলা বানিয়েছেন, আমাকেও তিনি বাউলা বানিয়েছেন। তুমি তোমার প্রাণপুরুষকে খুঁজে পেয়েছিলে। আমি পাইনি। আমি এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছি।*

---

* হাসন রাজার গান 'নিশা লাগিল রে' আমি আমার ছবি 'আগুনের পরশমনি'তে অতি সম্প্রতি ব্যবহার করেছি।

তিনি

রাত ন'টার মত বাজে। আমি কি যেন লিখছি হঠাৎ আমার মেজো মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, বাবা খুব বিখ্যাত মানুষ তোমাকে টেলিফোন করেছেন।

আমি দেখলাম আমার মেয়ের মুখ উত্তেজনায় চকচক করছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। বিখ্যাত মানুষরা যে আমাকে একেবারেই টেলিফোন করেন না তাতো না। মেয়ে এত উত্তেজিত কেন?

'বাবা তুমি কিন্তু আবার বলতে বলবে না যে তুমি বাসায় নেই। তোমার বিশ্রী অভ্যাস আছে বাসায় থেকেও বল বাসায় নেই।

আমি বললাম, টেলিফোন কে করেছে মা?

আমার মেয়ে ফিসফিস করে বলল, জাহানারা ইমাম।

এই নাম ফিসফিস করে বলছ কেন? ফিসফিস করার কি হল?

'বাবা উনি যখন বললেন, তার নাম জাহানারা ইমাম তখন আমি এতই নার্ভাস হয়ে গেছি যে, তাকে স্লামালিকুম বলতে ভুলে গেছি।'

'বিরাট ভুল হয়েছে। যাই হোক দেখা যাক কি করা যায়।'

'আমি টেলিফোন ধরলাম এবং বললাম, 'আমার মেয়ে আপনাকে সালাম দিতে ভুলে গেছে এই জন্যে সে খুব লজ্জিত। আপনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন। সে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।'

ওপাশ থেকে তার হাসির শব্দ শুনলাম। হাসতে হাসতেই বললেন, 'আমি কিন্তু আপনাকে টেলিফোন করেছি কিছু কঠিন কথা বলার জন্যে।'

'বলুন।'

'আপনি রাগ করুন বা না করুন কথাগুলো আমাকে বলতেই হবে।'

'আমি শংকিত হয়ে আপনার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'আপনি স্বাধীনতাবিরোধীদের পত্রিকায় লেখেন কেন? আপনার মত আরো অনেকেই এই কাজটি করে। কিন্তু আপনি কেন করবেন?'

তিনি কথা বলছেন নিচু গলায়, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে কোন অস্পষ্টতা নেই। কোন আড়ষ্টতা নেই।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। আক্রমণ এইদিক থেকে আসবে ভাবিনি। তবে পত্রিকায় লেখা দেয়ার ব্যাপারে আমার কিছু যুক্তি আছে। খুব যে দুর্বল যুক্তি তাও না। যুক্তিগুলো তাকে শোনালাম। মনে হল এতে তিনি আরো রেগে গেলেন। কঠিন গলায় বললেন, 'আপনার মিসির আলী বিষয়ক রচনা আমি কিছু কিছু পড়েছি, আপনি যুক্তি ভাল দেবেন তা জানি। কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে যুক্তি শুনতে চাচ্ছি না। আপনাকে

কথা দিতে হবে ওদের পত্রিকায় লিখে ওদের হাত শক্তিশালী করবেন না। আপনি একজন শহীদ পিতার পুত্র। 'তুই রাজাকার' শ্লোগান আপনার কলম থেকে বের হয়েছে। বলুন আর লিখবেন না।'

আমি সহজে প্রভাবিত হই না। সে রাতে হলাম। বলতে বাধ্য হলাম, আপনাকে কথা দিচ্ছি আর লিখব না। এখন বলুন আপনার রাগ কি কমেছে? তিনি হেসে ফেললেন। বাচ্চা মেয়েদের একধরনের হাসি আছে — কুটকুট হাসি, বড়দের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে যে হাসিটা তারা হাসে সেই হাসি।

আমি বললাম, 'আমি সবসময় লক্ষ্য করেছি আপনি আমাকে আপনি আপনি করে বলেন। নিজেকে খুব দূরের মানুষ মনে হয়। দয়া করে আমাকে তুমি করে বলবেন।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা বলব। এখন থেকে বলব।'

তিনি কিন্তু আমাকে 'তুমি' কখনই বলেননি। যতবারই মনে করিয়ে দিয়েছি ততবারই বলেছেন, 'হ্যাঁ এখন থেকে বলব।' কিন্তু বলার সময় বলেছেন 'আপনি'। হয়তো আমাকে তিনি কখনোই কাছের মানুষ মনে করেননি।

তার অনেক কাছের মানুষ ছিল আমার মা। আমার ছোট ভাই জাফর ইকবাল। জাফর ইকবালের উল্লেখ তার লেখাতে পাই। ব্যক্তিগত আলাপেও জাফর ইকবালের প্রসঙ্গে তাকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখি। শুধু আমার ব্যাপারেই এক ধরনের শীতলতা। হয়তো তার ধারণা হয়েছিল, যে মহান আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি দিচ্ছেন আমি সেই আন্দোলন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি। যে ১০১ জনকে নিয়ে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আদি যাত্রা, আমি সেই ১০১ জনের একজন । অথচ পরে আমার আর কোন খোঁজ নেই। কাজেই আমার ভূমিকায় অস্পষ্টতাতো আছেই। তিনি আমার প্রতি শীতল ভাব পোষণ করতেই পারেন। সেটাই স্বাভাবিক।

আরেক দিনের কথা, তিনি টেলিফোন করেছেন। গলার স্বর অস্পষ্ট। কথা কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, 'আপনার শরীর কি খারাপ করেছে?'

তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন, 'শরীর আছে শরীরের মতই। আপনাকে একটা ব্যাপারে টেলিফোন করেছি।'

'বলুন কি ব্যাপার।'

'এই যে একটা আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এতে অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আমাকে চলতে হচ্ছে মানুষের চাঁদায়। আপনি প্রতিমাসে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের চাঁদা দেবেন।'

'অবশ্যই দেব'।

'আমি একজনকে পাঠাচ্ছি। এ মাসের চাঁদা দিয়ে দিন।'

'জ্বি আচ্ছা, কত করে দেব?'

'আপনি আপনার সামর্থ্য মত দেবেন। মাসে দু'হাজার করে দিতে পারবেন?'

'পারব।'

একজন এসে চাঁদা নিয়ে গেল। পরের দু'মাস কেউ চাঁদা নিতে এলো না। আমার

একটু মন খারাপ হল। মনে হল হয়ত সিদ্ধান্ত হয়েছে আমার কাছ থেকে চাঁদা নেয়া হবে না। তৃতীয় মাসে তিনি টেলিফোন করে বললেন, 'কি ব্যাপার, আপনি আপনার চাঁদার টাকা দিচ্ছেন না কেন?'

আমি বিনীতভাবে বললাম, 'কেউ তো নিতে আসেনি।'

'আমার এত লোকজন কোথায় যে পাঠাব! আপনি নিজে এসে দিয়ে যেতে পারেন না? আপনিতো এলিফেন্ট রোডেই থাকেন। দু'মিনিটের পথ।'

'আমি আসছি। ভাল কথা আপনার সঙ্গে রাগারাগি করার মত একটা ঘটনা ঘটেছে। আমি এসেই কিন্তু রাগারাগি করব।'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এসে নেই তারপর বুঝবেন।'

'না এখনই বলুন।'

'আমার বড় মেয়ে নোভার ছিল মাথা ভর্তি চুল। আপনি হচ্ছেন তার আদর্শ। আপনার মাথার ছোট ছোট চুল তার খুব পছন্দ। সে আপনার মত হবার প্রথম ধাপ হিসেবে তার মাথার সব চুল কেটে ফেলেছে।'

'সত্যি?'

'বাসায় আসুন। বাসায় এসে দেখে যান।'

একেবারে কিশোরী গলায় তিনি অনেকক্ষণ হাসলেন। তারপর বললেন, 'আপনার মেয়েকে বলবেন লম্বা চুল আমার খুব প্রিয়। আমি যখন ওর বয়েসী ছিলাম তখন আমার হাঁটু পর্যন্ত লম্বা চুল ছিল। ছবি আছে। আমি আপনার মেয়েকে ছবি দেখাব। চুল কেটে ছোট করতে হয়েছে ক্যান্সারের জন্যে। কেমোথেরাপির কারণে চুল পড়ে যাচ্ছিল। কি আর করব?'

তিনি একবার আমার বাসায় আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমার মেয়েদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করবেন। তাঁর গল্প করতে ইচ্ছা করছে। গাড়ি পাঠিয়ে তাকে আনালাম। বাসায় আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। গ্রহ যেমন সূর্যকে ঘিরে রাখে আমার মেয়েরাও তাকে সেই ভাবে ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়ল। তিনি তাদের বললেন তাঁর শৈশবের কথা। আমি আসরে যোগ দিতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, আপনি আসবেন না। এই আসরে আপনার প্রবেশাধিকার নেই।

অন্যান্য ফ্ল্যাটে খবর চলে গেছে। ছেলেমেয়েরা আসছে। তারাও গল্প শুনতে চায়।

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে পড়ল, অতি সম্মানিত এই মানুষটিকে সে কি খাওয়াবে? তিনি তো কিছুই খেতে পারেন না।

তিনি আমার স্ত্রীকে আশ্বস্ত করলেন, শুধু মুখে যাবেন না। কিছু খাবেন। পাকা পেঁপে থাকলে ভাল হয়।

ঘরে পাকা পেঁপে নেই। আমি ছুটলাম পাকা পেঁপের সন্ধানে। লিফট থেকে নামতেই এক ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে বললেন, জানেন, আমাদের এই ফ্ল্যাটের

কোন এক বাড়িতে জাহানারা ইমাম এসেছেন।

আনন্দে আমার মন দ্রবীভূত হল। এই মহীয়সী নারী কত অল্প সময়ে মানুষের হৃদয় দখল করে নিয়েছেন।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ আমাকে দেন আসাদুজ্জামান নূর।

বাসায় তখন ক্যাসেট প্লেয়ার বাজছে। আমার মেয়েরা জন ডেনভারের গান শুনছে 'রকি মাউন্টেন হাই, কলারাডো।' সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েরা তাদের নিজেদের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আমার মা আমার কাছে জানতে চাইলেন, আন্দোলন এখন কে এগিয়ে নিয়ে যাবে? আমি তাঁকে বললাম, দ্বিতীয় জাহানারা ইমাম আমাদের নেই। জাহানারা ইমাম দু'টা তিনটা করে জন্মায় না। একটাই জন্মায়। তবে কেউ না কেউ এগিয়ে আসবেই। অপেক্ষা করুন।

মা জায়নামাজে বসলেন।

আর আমি একা একা বসে রইলাম বারান্দায়। এক ধরনের শূন্যতা বোধ আমার ভেতর জমা হতে থাকল। কেবলি মনে হতে লাগল একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। কি পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এই মানুষটির প্রতি আমার ছিল তা তাকে জানানো হয়নি। আমার একটাই সান্ত্বনা মৃত্যুর ওপাশের জগৎ থেকে আজ তিনি নিশ্চয়ই আমার বিপুল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অনুভব করতে পারছেন। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি সবসময়ই তাঁর পাশে ছিলাম। যে ক'দিন বেঁচে থাকব তাই থাকব। বঙ্গ-জননীর পাশে তার সন্তানরা থাকবে না তা কি কখনো হয়?

বাংলার পবিত্র মাটিতে তাঁর পায়ের চিহ্ন আর পড়বে না। স্বাধীনতাবিরোধীদের এই সংবাদে উল্লসিত হবার কিছু নেই। বাংলার হৃদয়ে তিনি জ্বেলে দিয়েছেন অনির্বাণ শিখা। ঝড়-ঝাপ্টা যত প্রচণ্ডই হোক না কেন সেই শিখা জ্বলতে থাকবে। কি সৌভাগ্য আমাদের তিনি জন্মেছিলেন এই দেশে।

প্রিয় পশু

"আপনার রাশি কি?"

"আপনার প্রিয় রঙ কি?"

"আপনার প্রিয় ফুল কি?"

এ জাতীয় প্রশ্নের জবাব আমাকে প্রায়ই দিতে হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি — আপনার প্রিয় পশু কি? সম্ভবত প্রশ্নকর্তাদের মনে কখনো আসেনি যে পশুরাও প্রিয় হতে পারে। গালি দেয়ার জন্যে পশু ব্যবহার করা হয় — পশু প্রিয় হবে কিভাবে! মানুষ ভয়ংকর কোন কাণ্ড করলে আমরা বলি — ব্যাটা নরপশু।

তারপরও সবারই বোধহয় প্রিয় পশু আছে। টিপু সুলতানের ছিল বাঘ, নিউটনের ছিল বিড়াল, যে বিড়াল জ্বলন্ত ল্যাম্প ফেলে পুড়িয়ে ফেলেছিল প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা নামের বিখ্যাত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। আমাদের দেশের বিখ্যাত এক ব্যক্তির প্রিয় পশু বানর। মাসে অন্তত একবার তিনি চিড়িয়াখানায় যান এবং হা করে বানরের খাঁচার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন। কে জানে মনে মনে হয়তো ভাবেন — বানর থেকে মানুষে বিবর্তন হওয়ার প্রয়োজনটা কি ছিল! বানর হয়ে গাছে গাছে জীবনটা পার করে দিতে পারলে জীবনটা কত সুখময় হত!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকের ছিল ছাগলপ্রীতি। তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারেই ছাগল পুষতেন। একটা-দু'টা না — গোটা সাতেক। রাতে ঘুমুতেন ছাগলের সঙ্গে। অবিশ্বাস্য এই ঘটনা শুনে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। তিনি বিরক্ত ভঙ্গিতে বললেন — এগুলি ছাগল না, পাঁঠা। আমার একটা অসুখ আছে। পাঁঠার গায়ের গন্ধে সেই অসুখ সারে বলে আমি রাতে তাদের সঙ্গে ঘুমাই।

আমি হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, এভাবে তাকাচ্ছেন কেন? আমি কি করি না করি তা আমার ব্যাপার। ব্যক্তি-স্বাধীনতা আমার সাংবিধানিক অধিকার। সংবিধানের . . . ধারার . . . উপধারায় . . . ।

আমি বললাম, তা তো বটেই। আপনি অবশ্যই পাঁঠাদের সঙ্গে ঘুমুতে পারেন।

প্রিয় পাঠক, আমি এই গল্প রসিকতার জন্যে ফাঁদিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় খোঁজ নিলেই ঘটনার সত্যতা জানতে পারবেন।

পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই — এমন কোন পশু কি আছে যা গোটা মানব সম্প্রদায়ের প্রিয়? বা বড় একটি মানবগোষ্ঠীর প্রিয়? আমার ধারণা আছে — সেই পশুর নাম 'হাতি', যাকে দেখামাত্র একসঙ্গে বিস্ময়, ভয় এবং করুণায় মন কেমন

কেমন করে ওঠে। বিস্ময় এবং ভয়ের কারণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। করুণা কেন হয় বলি। করুণা হয় — বিশাল একটা প্রাণী মানুষের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর হাতের পুতুল হয়ে ঘুরছে, এই কারণে। একটা পিঁপড়া ছাগলের গলায় দড়ি বেঁধে তাকে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে — এই দৃশ্যে যে করুণ রস আছে, হাতি এবং মানুষের ব্যাপারে তেমন করুণ রস আছে।

আমাদের বাংলাদেশের মানুষের কাছে হাতি খুবই পরিচিত প্রাণী। এইত সেদিন ঢাকা শহরে এক বিয়েতে দেখলাম হাতিতে চেপে বর যাচ্ছে। বেচারার উচিত এক হাতে রুমাল নিয়ে রুমালে মুখ চেপে ধরে রাখা। সে তা করছে না। ভয়ে অস্থির হয়ে দু'হাত দিয়ে জাপটে সামনের মানুষটির কোমর ধরে আছে।

ছোটবেলায় খুব কাছ থেকে হাতি দেখার সৌভাগ্য হল নানার বাড়িতে। আমার এক দূর-সম্পর্কের নানা চেয়ারম্যান ইলেকশনে দাঁড়িয়েছেন। তার মার্কা হল হাতি। তিনি নির্বাচনী প্রচারণার জন্যে এক হাতি নিয়ে এলেন। হাতির পিঠে চড়ে তিনি প্রচার-অভিযানে বের হন — গ্রামের অর্ধেক মানুষ সেই হাতির পেছনে পেছনে যায়। আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে — "ভোট দিবেন কিসে?" "হাতী মার্কা বাক্সে।" শুধুমাত্র হাতির কল্যাণে আমার সেই দূর-সম্পর্কের নানা ইলেকশনে পাশ করে ফেলেন। সেই ইলেকশনের হাতিতে আমি অনেকবার চড়েছি। হাতির পিঠে চড়া সম্পর্কে যা যা জেনেছি তা হচ্ছে —

"হাতির পিঠে চড়া এবং নৌকায় চড়া এক রকম। দুটোতেই দুলুনি আছে। একই রকম দুলুনি।"

"নাক ভর্তি সর্দি না থাকলে হাতির পিঠে চড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হাতির গায়ে একশ হর্স পাওয়ারের বিকট গন্ধ।"

হাতির গায়ের লোম সাধারণ লোমের মতো না — সুইয়ের মত শক্ত। লোমের পেছনে ফুটো থাকলে অনায়াসে গ্রামের মেয়েরা হাতির লোম দিয়ে কাঁথা সেলাই করতে পারত।

শৈশবে বেশ কিছুদিন হাতির কাছাকাছি থাকার কারণে আমার ধারণা হয়েছিল — হাতি সম্পর্কে আমি একজন "নলেজেবল" ব্যক্তি। এই বিরাট পশু সম্পর্কে যা জানার সবই জেনে ফেলেছি। আরো যে অনেক কিছু জানার বাকি তা টের পেলাম এই সেদিন। ঘটনাটা বলি — ঈদের আনন্দমেলা অনুষ্ঠান। আমার উপর দায়িত্ব একটা ছোট্ট তিন-চার মিনিটের হাসির অংশ তৈরি করা। আমি হাতি দিয়ে একটা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করলাম। হাতির পিঠে চড়ে 'অয়োময়ে'র ছোট মীর্জা এবং তার লাঠিয়াল হানিফ এসেছে গাউছিয়ায় ঈদের বাজার করতে।

দু'টা হাতি আনানো হল। প্রথমটায় ছোট মীর্জার লোকজন। দ্বিতীয়টায় লাঠিয়ালসহ ছোট মীর্জা। প্রচণ্ড রোদের ভেতর শু্যটিং চলছে। হঠাৎ ছোট মীর্জা আসাদুজ্জামান নূর এবং লাঠিয়াল মোজাম্মেল হোসেনের বিকট চিৎকার — ভিজিয়ে

ফেলেছে। ভিজিয়ে ফেলেছে।

ব্যাপার বিচিত্র। হাতি কিছুক্ষণ পর পর তার শুঁড় মুখে ঢুকিয়ে এক ধরনের জলীয় পদার্থ টেনে এনে তার সারা গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। হাতির মাহুত বলল, গরমের সময় হাতি এইটা করে। পেটের ভেতর থেকে পানি এনে শরীর ভিজিয়ে দেয়।

শু্যটিং এগুচ্ছে। মহাপরাক্রমশালী ছোট মীর্জা এবং তার ভয়ংকর লাঠিয়াল কিছুক্ষণ পর পর চেঁচাচ্ছে — সর্বনাশ! আবার ভিজিয়ে দিয়েছে! পেটের ভিতর থেকে হাতি কি টেনে এনে আমাদের ভিজাচ্ছে — আল্লাহ জানেন!

হাতিকে আমরা খুব বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে জানি। অথচ মূর্খের উপমা দেবার সময় বলি — হস্তীমূর্খ। ব্যাপারটা মজার না? হস্তীমূর্খ কেন বলা হয় আমি বের করেছি। আপনাদের ব্যাখ্যা করে বলি।

কিছুদিন আগে আমার একজন প্রকাশক 'সময়' প্রকাশন'-এর ফরিদ আহমেদ আমাকে বলল, হুমায়ূন ভাই! শ্রীমঙ্গলে দু'টা ছোট ছোট হাতির বাচ্চা আছে। হাতির ব্যাপারে আপনার তো খুব আগ্রহ, দেখতে যাবেন?

আমি বললাম, অবশ্যই যাব।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে চললাম হস্তী-শাবকের সন্ধানে। পাহাড় থেকে কাঠ কেটে নামানোর জন্যে সেখানে প্রচুর হাতি ব্যবহার করা হয়। হাতি বেচা-কেনাও হয়। একটি পরিণত বয়সের হাতির দাম পাঁচ লাখ টাকা। অল্পবয়সী হাতি তিন লাখ টাকায় পাওয়া যায়। কাঠ-টানা হাতিগুলি অমানুষিক পরিশ্রম করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঠ টানে। কোন বিশ্রাম নেই। এক দিনের পরিশ্রম বাবদ হাতির মালিক পান দু'হাজার টাকা। দিনের পর দিন এই কাঠ টানা চলতে থাকে। প্রচণ্ড শক্তিধর এই প্রাণী ইচ্ছা করলেই মাহুতকে গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে বনে ফিরে যেতে পারে — তা সে করে না। মুখ বুঁজে অত্যাচার সহ্য করে — সে যদি মূর্খ না হয় — মূর্খ কে?

হাতির বাচ্চা দেখার জন্যে এক ভোরবেলা শ্রীমঙ্গল থেকে মাইক্রোবাসে করে রওনা হলাম। বাচ্চারা কমলা কিনে নিল হাতির বাচ্চাকে খাওয়াবে। সঙ্গে ভিডিও ক্যামেরা নেয়া হল। হাতির বাচ্চার গলা জড়িয়ে ধরে ছবি তোলা হবে। আমার বাচ্চাদের উৎসাহের সীমা নেই।

হাতির বাচ্চা দেখে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। ছোটখাট একটা হাতি। সামনের দু'টা পা এবং পেছনের দু'পা শিকল দিয়ে বেঁধে টানা দিয়ে রাখা হয়েছে। তার নড়াচড়ার শক্তি নেই। তার শুঁড় নানান জায়গায় কাটা। রক্ত পড়ছে। চোখ ভেজা। সে নিঃশব্দে কাঁদছে। জানা গেল, বাচ্চাকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে যাতে সে বন থেকে কাঠ টেনে আনতে পারে এই ট্রেনিং। আমি বললাম, এর বয়স কত?

মাহুত বলল, তিন বছর।

'একে আপনারা মারছেন?'

'না মারলে শিখবে কিভাবে?'

'এভাবে টানা দিয়ে কতক্ষণ রাখা হয়?'

'মাঝে মাঝে দু'দিন-তিনদিনও রাখা হয়। খাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। হাতির ট্রেনিং বড়ই কঠিন।'

তিন বছর বয়েসী হাতির বাচ্চা হুংকারের মত করল। মাহুত সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে তার শুঁড়ে লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড বাড়ি বসাল। আমরা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ছবি হল না, ভিডিও ক্যামেরায় ভিডিও করা হল না। মানুষ হয়ে জন্মেছি, এই লজ্জা ও এই অপমান সহ্য করে মাথা নিচু করে ফিরে চলে এলাম। মনে মনে বললাম, জগতের সমস্ত পশু, তোমরা আমাদের মানুষ হয়ে জন্মানোর এই অপরাধ ক্ষমা করে দাও।

একদিন চলিয়া যাব

আমার বড় মামা খুব অসুস্থ। মৃত্যুশয্যা পেতেছেন। তিনি শেষবারের মত তাঁর সব প্রিয়জনদের দেখতে চান, এই খবর পেয়ে আমি ছুটে গেলাম নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে। মামার সঙ্গে দেখা হল না। আমি পৌঁছলাম বিকেলে, তিনি মারা গেলেন সেইদিন সকালে। মৃত্যুশোকে পাথর হয়ে আছে আমার নানার বাড়ি। গিজ গিজ করছে মানুষ। মেয়েরা সুর করে কাঁদছে। মাদ্রাসার তালেবুল এলেমরা চলে এসেছে — তার কোরান পাঠ শুরু করেছে।

আমি প্রচণ্ড শোকেও চাপা এক উৎসবের ছোঁয়া পেলাম। বড় কোন উৎসবের আগে যে উত্তেজনা থাকে, যে ব্যস্ততা থাকে — এখানেও তাই। মুরুব্বিরা উঠোনে গোল হয়ে বসে আছেন। তাঁরা গম্ভীর মুখে তামাক টানছেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁদের কাছ থেকে আসছে। মরা-বাড়িতে তিনদিন কোন আগুন জ্বলবে না। খাবার আসবে বাইরে থেকে। এই খাবারের নাম তোলা খাবার। কোন্ কোন্ বাড়ি থেকে এই খাবার আসবে তার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। তোলা খাবার সবাই পাঠাতে চায়। কিন্তু সবার খাবার নেয়া যাবে না। সামাজিক মানমর্যাদার ব্যাপার আছে।

খান সাহেবের বাড়ি থেকে একবেলা তোলা খাবার পাঠানোর প্রস্তাব এসেছে। এই প্রস্তাবে সবাই বিব্রত। এই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাচ্ছে না, আবার তাঁদের 'না' বলাও যাচ্ছে না। তাঁরা ক্ষমতাশালী। এই ভয়াবহ (!) সমস্যার সমাধান বের করার জন্যে মুরুব্বিরা নিচু গলায় ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছেন। তামাক পুড়ছে প্রচুর।

মুরুব্বিদের দ্বিতীয়দল (এরা অনেক বয়স্ক। এদের কেউ কেউ অথর্ব পর্যায়ে চলে গেছেন। চলচ্ছক্তি নেই, চোখে দেখেন না — এমন) অন্য সমস্যা নিয়ে বসেছেন — কে গোসল দেয়াবে? মড়ার গায়ে এক বালতি পানি ঢেলে দিলে তো হবে না। জটিল নিয়ম-কানুন আছে। সবাই এইসব নিয়ম জানে না। যে জানে তাকে দিয়ে গোসল দেয়ানো যাবে না, কারণ সে 'শরাব' খায় — এরকম গুজব সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে। মুরুব্বিদের একজন বললেন, আচ্ছা ফজলু কি মৃত্যুর আগে কিছু বলেছে — কে তারে গোসল দিব? বা কবর কোনখানে হবে?

'না, বলে নাই।'

'বলে গেলে কাজকর্মের সুবিধা হয়। বলে যাওয়া উচিত।'

মৃতের উপর রাগ করা যায় না, তবে মৃতের বোকামির জন্যে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হওয়া যায়।

ভেতর বাড়ি থেকে মেয়েরা চিৎকার করে কাঁদছে। এত উঁচু স্বরে বিলাপ শরিয়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাদেরকে গলা নিচু করতে বলা হল। তালেবুল এলেমরা কোরান

শরীফ এত 'মাধা' গলায় পড়ছে কেন? গলায় জোর নাই? তাদের মৃদু ধমক দেয়া হল।

আত্মীয়স্বজন সবাই কি খবর পেয়েছে? ভুলক্রমে কাউকে খবর না দেয়া হলে বিরাট জটিলতা হবে। যাদের খবর দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কারা কারা উপস্থিত হয়েছে? সবাই উপস্থিত না হলে জানাজার সময় ঠিক করা যাবে না।

কবর দিয়ে দিতে হবে আসরের নামাজের পর পর। দেরি করা যাবে না। কবর দিতে দিতে মাগরেবের নামাজের সময় হয়ে যাবে। মসজিদে মাগরেবের নামাজ আদায় করে গোরযাত্রীরা ঘরে ফিরবে।

'কবরের জায়গা কি ঠিক হয়েছে?'

হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। বাড়ির পেছনে। গোরস্থানে কবর হলে মেয়েছেলেরা যেতে পারে না। মৃত ছেলের মা ছেলের কবর ঘরের পাশে চাচ্ছেন, যাতে তিনি যখন-তখন যেতে পারেন।

মসজিদের লাগোয়া গোরস্থানে কবর হলেই ভাল হত। তবু মা'র ইচ্ছাই বড়। বাড়ির পেছনে কবর খননের অনুমতি দেয়া হল। তখনই আসল সমস্যা দেখা দিল। যে কবর খুঁড়বে সে নেই। সে গিয়েছে শম্ভুগঞ্জ, তার মেয়ের বাড়ি। কি সর্বনাশ! শম্ভুগঞ্জ থেকে তাকে ধরে আনার জন্যে তৎক্ষণাৎ লোক ছুটল। মনে হচ্ছে বাদ আছর কবর হবে না। বিলম্ব হবে। উপায় কি? আল্লা আল্লা করে ঐ লোককে পাওয়া গেলে হয়।

আমি ভেবে পেলাম না, মোহনগঞ্জের মত এত বড় একটা জায়গায় কবর খোঁড়ার কি একজনই মানুষ? আমার অজ্ঞতায় সবাই মজা পেলেন। আমাকে জানানো হল, জালাল উদ্দিন কবর খোঁড়ার ব্যাপারে অঞ্চল-বিখ্যাত। তার মত সুন্দর করে কেউ কবর খুঁড়তে পারে না। তাকে না পাওয়া গেলে এক কথা। পাওয়ার সম্ভাবনা যখন আছে চেষ্টা করা যাক।

আমি নিচু গলায় বললাম, কবর খোঁড়ার মধ্যে সুন্দর-অসুন্দর কি আছে?

আমার নির্বুদ্ধিতায় আবারো সবাই বিরক্ত হলেন।

'মানুষের আসল বাড়ি কবর। সেই বাড়িটা সুন্দর করে বানাতে হবে না? দালানকোঠা সুন্দর করে বানিয়ে ফয়দা কি?'

জালাল উদ্দিন এসে পৌঁছলেন রাত দশটায়। রোগা পাতলা মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। পানের ব্যবসা করেন। তুচ্ছ ধরনের ব্যবসা। কেউ তাকে পোছে না। কিন্তু কারো মৃত্যু হলে সবাই তাঁর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। জালাল উদ্দিনকে লাগবে। যেখান থেকে পার তাকে ধরে আন।

তিনটা হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে কবর খোঁড়া শুরু হল। আমি গভীর আগ্রহে কবর খোঁড়া দেখছি। জালাল উদ্দিন মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে তুলছেন। মনে হচ্ছে কাজটায় তিনি আনন্দ পাচ্ছেন। এক সময় মুখ তুলে হাসিমুখে বললেন, ফজলুর ভাগ্য ভাল। মাটি ভাল পাইছি। সচরাচর এমন ভাল মাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েদের মধ্যে কে যেন এদিকে এসে পড়ল। তাকে প্রচণ্ড ধমক দেয়া হল।

মেয়েদের কবর খোঁড়া দেখতে নেই। এটা পুরুষদের কাজ। কবর খোঁড়া শেষ হল রাত একটায়। জালাল উদ্দিন তাঁর কাজ শেষ করে উঠে পড়লেন। হ্যাজাকের আলো ফেলা হল কবরে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম — এটা সামান্য গর্তবিশেষ নয়। এ এক শিল্পকর্ম। পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পকর্মের মত এই শিল্পকর্মের দিকেও মুগ্ধ হয়ে তাকানো যেতে পারে।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলল, ফজলুর ভাগ্য আসলেই ভাল। কবরটা যেন হাসতেছে।

আমি বললাম, আমি একটু কবরে নেমে দেখতে চাই।

কেউ কোন আপত্তি করল না। শুধু বলা হল যেন অজু করে নামা হয়। আমি অজু করে কবরে নেমেছি। আমার চারদিকে মাটির দেয়াল। যারা উপরে আছে তাদের কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি না। হঠাৎ আমার মনে হল — আমাকে যেন আলাদা করে ফেলা হয়েছে — এই পৃথিবী, এই অনন্ত নক্ষত্রবীথির সঙ্গে আর আমার কোন যোগ নেই।

জীবনে কোন বড় ধরনের অতিপ্রাকৃত অনুভূতির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। সেই মধ্যরাত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই প্রথম এবং এ পর্যন্ত শেষ অভিজ্ঞতা।

খেলা

আমার বন্ধু-কন্যা লীনা টেলিফোন করেছে। তার গলার স্বর ভারী ও বিষণ্ণ। আমি বললাম, কি হয়েছে রে? সে বলল, চাচা, আজ কি কোন কারণে আপনার মন খারাপ? আমি অবাক হয়ে বললাম, কই, না তো।

'ঠিক মত ভেবে তারপর বলুন। হুট করে বলবেন না।'

'না, আমি ভালই আছি। আমার মন খারাপ করার মত কিছু কি ঘটেছে?'

'বাংলাদেশ যে মালদ্বীপের সঙ্গে ফুটবল খেলায় ড্র করলো এতে আপনার মন খারাপ হয়নি?'

'ও আচ্ছা, তা মন খারাপ কিছুটা হয়েছে।'

'আপনি কি এই মন খারাপের কারণে আপনার মেয়েদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন?'

'ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করব কেন? ওরা তো আর ড্র করেনি।'

'তাহলে বাবা কেন আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে? বাবা কেন শুধু শুধু আমাকে চড় মারলো?

টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে কান্নার শব্দ আসতে লাগলো। হাউমাউ ধরনের কান্না। এতক্ষণে রহস্য ভেদ হলো। বোঝা যাচ্ছে, মালদ্বীপের সঙ্গে ড্র করার পর আমার বন্ধু রফিকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বাড়িতে মারধোর শুরু করেছে। রফিকের ক্ষেত্রে এই আচরণ খুবই স্বাভাবিক। ফুটবল আছে তার শয়নে, স্বপনে চিন্তায় ও নিদ্রায়। লীগের খেলা হচ্ছে আর সে মাঠে নেই, এ হতেই পারে না।

তার পাল্লায় পড়ে একবার লীগ ফাইন্যাল দেখতে গিয়েছি। তার প্রিয় দল তেমন সুবিধা করতে পারছে না। তাকিয়ে দেখি তার চেহারা বিবর্ণ। বিড়বিড় করে কি সব দোয়া পড়ছে। এক সময় সে তার পাঞ্জাবির সব বোতাম খুলে ফেলল। পায়জামার ফিতার গিঁট আলগা করে দিল। আমি হতভম্ব। হচ্ছে কি? রফিক বলল, 'কুসাইত' লেগে গেছে। এই সব করলে 'কু' কাটা যায়।

সেদিন পায়জামার ফিতা খোলার জন্যেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক রফিকের দল জিতে গেল। অবাক হয়ে তার আনন্দ প্রকাশের ভঙ্গি দেখলাম। তিন ছেলেমেয়ের বাবা, একটা কলেজে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ায়, সেই লোক খালি গা হয়ে তার পাঞ্জাবি একবার আকাশে ছুঁড়ে মারছে আর লুফে নিচ্ছে। মুখে চিঁহি ধরনের শব্দ করছে, যে শব্দ ঘোড়ার মুখেই মানায়। আমি বলতে বাধ্য হলাম, 'তুই পাগল হয়ে গেলি নাকি? সামান্য একটা খেলা।'

রফিক চোখ লাল করে বলল, 'উইথড্র ইয়োর ওয়ার্ড। ফুটবল কোন খেলা না,

ফুটবল হল লাইফ।'

বাঙালী ফুটবলের ব্যাপারে স্পর্শকাতর তা জানি। নব্বুই-এর বিশ্বকাপের পর পর 'অয়োময়' নাটকের শ্যুটিং-এর জন্যে পুরো দলবল নিয়ে ময়মনসিংহ গিয়েছিলাম। শ্যুটিং চলছে। হঠাৎ শুনি, রাস্তায় বিকট চিৎকার, ভয়াবহ হৈ-চৈ। শ্যুটিং বন্ধ করতে হল। দেখা গেল, মিছিল বের হয়েছে। মিছিলের মানুষ শ্লোগান দিচ্ছে — 'মানি না। মানি না। বিশ্বকাপের সিদ্ধান্ত মানি না।' ব্যাপার হল, আর্জেন্টিনার পরাজয় তারা মানে না। এই জন্যেই মিছিল। কোথায় বিশ্বকাপ আর কোথায় বাংলাদেশের এক মফস্বল শহরের মিছিল। ফুলবল নিয়ে কোন্ পর্যায়ের স্পর্শকাতরতা থাকলে এ জাতীয় পাগলামি করা যায় তা সহজেই অনুমেয়। সেই স্পর্শকাতরতা যে কোন ধরনের তা রফিককে খুব কাছে থেকে না দেখলে জানা যেত না। কাজেই আমি বন্ধু-কন্যার কান্নায় বিস্মিত হলাম না। লীনাকে বললাম তার বাবাকে টেলিফোন দিতে। লীনা কাঁদতে কাঁদতেই তার বাবাকে ডাকতে গেল।

'রফিক, কি হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। হবে আবার কি?'

'তুই ভাল তো?'

'হুঁ।'

'খুব নাকি হৈ-চৈ করছিস? বাংলাদেশ মালদ্বীপের সঙ্গে ড্র করেছে তো কি হয়েছে?'

'তোর কাছে এটা খুব সামান্য ব্যাপার মনে হচ্ছে?'

'দুঃখজনক ব্যাপার তো বটেই। তবে ড্র করায় পরের খেলাগুলি ভাল হবে। বাংলাদেশী প্লেয়াররা লজ্জা পেয়ে জান দিয়ে খেলবে। দেখবি নেপালকে হারিয়ে ভূত বানিয়ে দেবে। এই ড্রটা আমাদের জন্যে শাপে বর হয়েছে।'

'কথাটা মন্দ বলিসনি।'

'রাগারাগি হৈ-চৈ বন্ধ করে স্বাভাবিক হ।'

'মালদ্বীপের সঙ্গে ড্রয়ের পর মনটা এত খারাপ হয়েছিল, ইচ্ছা করছিল সেলুনে গিয়ে নিজের মাথাটা কামিয়ে ফেলি। কি অপমান!'

'অপমানের কিছু না। অঘটন ফুটবলে মাঝে মাঝে ঘটে। দেখবি, ফুটবলে সোনা এবার আসবে আমাদের ঘরে।'

'ইনশাআল্লাহ বল দোস্ত। ইনশাআল্লাহ না বললে শেষে — '

আমি ইনশাআল্লাহ বললাম। রফিকের আনন্দের সীমা রইল না। সেও আমার সঙ্গে একশ' ভাগ একমত হল, এবারের সোনা আমাদের।

বাংলাদেশ হারলো নেপালের কাছে। আমাদের ফুটবল টীম পুরো জাতিকে বিরাট লজ্জায় ফেলে দিল। আমার নিজেরই এত খারাপ লাগছে, রফিকের না জানি কেমন লাগছে। তার বাসায় টেলিফোন করলাম। সে টেলিফোন ধরলো না। তার স্ত্রী

জানালো, রফিক আজ খেলা জেতার জন্যে মানত করে রোজা রেখেছিল। এখন ঘর অন্ধকার করে দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়ে আছে। কারো সঙ্গে কথা বলছে না।

'রাগারাগি করছে না তো?'

'না। তা করছে না। ভাই, আপনি একবার আসুন। তার সঙ্গে কথা বলে তাকে শান্ত করে যান।'

'আচ্ছা আমি আসছি।'

আমি রফিককে শান্ত করার জন্যে যাচ্ছি। রিকশা নিয়েছি। রিকশাওয়ালা বলল, 'ঘটনা কি হইছে দেখছেন স্যার? ভালমত কেউ খেলে নাই। পাও বাঁচাইয়া খেলছে।'

'পা বাঁচিয়ে খেলাটা কি?'

'সামনে লীগের খেলা। পা জখম হইলে খেলব কি? আর না খেললে লাখ টেকা ক্যামনে পাইব?'

পরাজয়ের দুঃখে রিকশাওয়ালা কাতর। শুধু রিকশাওয়ালা নয়, পুরো জাতি আজ বিষণ্ন। এই বিষণ্নতা কি আমাদের লাখ টাকা দামী খেলোয়াড়দের স্পর্শ করেছে? আজ তাঁরা কেমন আছেন সোনারগাঁ হোটেলে? তাঁরা কি সত্যি সত্যি জানেন বাতাসভরা ছোট একটা চামড়ার বল নিয়ে ছোটাছুটির এই খেলার সঙ্গেও জাতির আত্মা মিশে যেতে পারে? যদি জানেন, তাহলে কেন এই মৃত্যুসম পরাজয়?

নেদারল্যাণ্ডের এক সাহেব একবার আমাকে বলেছিলো, 'তোমরা এই খেলাটা খেলতে পার না। তারপরেও এই খেলার প্রতি তোমাদের এত মমতা কেন? কারণটা কি?'

আমি সাহেবকে বললাম, 'বাংলাদেশ মানেই বর্ষা, আর বর্ষা মানেই ফুটবল।'

'তার মানে?'

'মানে তুমি বুঝবে না। বাদ দাও।'

সাহেবের সঙ্গে বকবক করতে ইচ্ছা করেনি। ইচ্ছা করলে বলা যেত — এই খেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ফেলে আসা শৈশব। ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ছে, একদল কিশোর বাতাবিলেবু নিয়ে নেমে পড়েছে মাঠে। যে যেদিকে পারছে কিক বসাচ্ছে। উত্তেজনার সীমা নেই। কাদায় গড়াগড়ি, পানিতে গড়াগড়ি। বাতাবিলেবুর স্টেজ পার হল, চাঁদা তুলে কেনা হল প্রথম চামড়ার ফুটবল। চামড়া নরম করার জন্য সেই ফুটবলে মাখন নিয়ে ঘষাঘষি। কি আনন্দ! কি আনন্দ! গঠন করা হল ফুটবল ক্লাব। সব ইংরেজি নাম — গ্রীন বয়েজ ক্লাব, টাইগার ক্লাব, . . .

টেলিভিশনে বিশ্বকাপের খেলা যখন দেখি তখন মনে হয় এরা তো আমাদের খেলা খেলছে, আমরা কেন খেলছি না?

বলা হয়, আমাদের শারীরিক যোগ্যতা নেই। আমাদের দম থাকে না।

তার মানে কি? ফুটবল খেলতে হলে দৈত্য হতে হবে? আর আমাদের দম না থাকলে কাদের থাকবে?

বলা হয়, আমাদের খেলোয়াড়রা ফুটবলের আধুনিক কৌশল জানেন না।

কৌশল জানেন না, শিখবেন। আমরা কি বেকুবের জাত যে শিখতেও পারব না?

আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখি, বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলছে। এগারোজন খেলোয়াড় তাঁদের জার্সির ভেতর বাংলাদেশের হৃদয়কে নিয়ে খেলতে নেমেছেন। ঐ তো বাংলাদেশ ছুটে যাচ্ছে গোলপোস্টের দিকে। কার সাধ্য তাদের রোখে?

জাপানী কৈমাছ

বৎসরের শুরুতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধনবান ব্যক্তিদের একটা তালিকা প্রস্তুত হয়। সংবাদ সংস্থাগুলি সেই তালিকার খবর দিকে দিকে পাঠিয়ে দেয়। খবরের কাগজগুলি আগ্রহ করে সেই খবর ছাপায়। আমরা মুগ্ধবিস্ময় নিয়ে সেই খবর পড়ি। অন্যদের পড়ে শোনাই। পৃথিবীর সেরা ধনীদের খবর জানতে আমাদের ভাল লাগে। আমাদের ঈর্ষাবোধ হয় না। বাড়ির কাছে মোটামুটি ধনীদের আমার ঈর্ষা করি, সেরা ধনীদের করি না। পৃথিবীর প্রথম দশজন বিত্তশালীর তালিকা প্রস্তুত হলেও সবচে' দরিদ্র দশজনের তালিকা আমরা প্রস্তুত করি না। প্রথমত কাজটা অসম্ভব। একজন ধনীর উপরে আরেকজন ধনী হতে পারে, কিন্তু নিঃস্বের নিচে নিঃস্ব নেই, এবং এদের সংখ্যা এক কোটির কাছাকাছি। এক কোটি মানুষের তালিকা তৈরির প্রয়োজন কি?

মজার ব্যাপার হচ্ছে, সত্যি সত্যি যদি নিঃস্বদের তালিকা তৈরি হত তাহলে দেখা যেত পৃথিবীর বেশিরভাগ ধর্মপ্রচারকদের নাম সেই তালিকায় আছে। এই খবরে জগতের নিঃস্বরা কোন মানসিক শান্তি লাভ করেন না। মহাপুরুষরা তাদের সঙ্গে থাকলেই কি আর না থাকলেই কি? তারা তো খেতে পারছে না। পূর্ণিমার চাঁদ তাদের কাছে ঝলসানো রুটি, যে রুটি আখের গুড় দিয়ে খেতে পারলে পেট শান্ত হত।

হঠাৎ করে ধনী-নিঃস্ব নিয়ে লিখতে বসলাম কেন সেই ব্যাপারটা বলে নেই। এ দেশের জনৈক ধনবান ব্যক্তির বাসায় যাবার দুর্লভ (!) সৌভাগ্য আমার সম্প্রতি হয়েছিল। বাড়িতে ঢুকে ঝিম মেরে গেলাম। যা দেখছি তাতেই চোখ স্থির হয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোক মিউজিয়ামের কিউরেটরের ভঙ্গিতে তাঁর বাড়ির প্রতিটি দুর্লভ সামগ্রীর বাংলাদেশী টাকায় মূল্য এবং ডলারের মূল্য বলে যাচ্ছেন। জিনিসটি কোন্ জায়গা থেকে কেনা হল সেই ইতিহাস বলছেন। তিনি বলে আরাম পাচ্ছেন, আমিও শুনে স্তম্ভিত হচ্ছি। তিনি এক পর্যায়ে বললেন, আসুন আসুন; আমার মাছের একোরিয়াম দেখুন। মজা পাবেন।

মজা পাবার উদ্দেশ্যে মাছের একোরিয়ামের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। একোরিয়াম বলা ঠিক হবে না। চৌবাচ্চা জাতীয় জিনিস। চারপাশে চেয়ার বসানো। চেয়ারে বসে মাছের খেলা দেখতে হয়। ভেবেছিলাম, পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য জাতীয় মাছ দেখব, মৎস্য-কন্যা টাইপ কিছু। তেমন দেখলাম না। দেখলাম বিশাল কৈ মাছ। শ্বেতী রোগ হলে গা যেমন শাদা হয়ে যায় তেমন শাদা, মাঝে মাঝে সোনালী ছোপ। এরচে' সুন্দর মাছ মধ্যবিত্তদের একোরিয়ামে সবসময়ই দেখা যায়।

ভদ্রলোক আগ্রহের সাঙ্গে বললনে, কেমন দেখলেন?

আমি শুকনো গলায় বললাম, ভাল। ইন্টারেস্টিং কৈ মাছ।

'শুধু ইন্টারেস্টিং কৈ মাছ বলে শেষ করবেন না। এগুলি জাপানী কৈ, চার'শ বছর বাঁচে।'

আমি এই খবরেও তেমন অভিভূত হলাম না। চার'শ বছর বেঁচে থেকে এরা আমাদের তেমন কোন উপকার করছে না। কচ্ছপও চার'শ বছর বাঁচে। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্যে এদের একোরিয়ামে রাখতে হলে কচ্ছপও রাখতে হয়।

'মাছগুলির দাম কত আন্দাজ করুন তো?'

'আন্দাজ করতে পারছি না। বুঝতে পারছি আকাশ-পাতাল কিছু হবে।'

'তবু আন্দাজ করুন।'

আমি আমার কল্পনাকে যতদূর সম্ভব প্রশ্রয় দিয়ে বললাম, প্রতিটি মাছ কুড়ি হাজার টাকা।

আমার অজ্ঞতায় ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন, গিনেস বুক অব ওয়ার্লড রেকর্ডে এই মাছ সম্পর্কে একটা তথ্য আছে। তথ্যটা হচ্ছে — পৃথিবীর সবচে' বেশি দামে বিক্রি হওয়া মাছ হল জাপানী কৈ মাছ। এরকম একটা মাছ বিক্রি হয়েছিল দু মিলিয়ন ইউএস ডলারে। অর্থাৎ বাংলাদেশী টাকায় কুড়ি লক্ষ টাকা।

আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, কে কিনেছে? আপনি?

'না, আমি কিনিনি। আমার কাছে সবচে' দামী যেটা আছে সেটা ৪০ হাজার ইউএস ডলার।'

'কোন্ মাছটা বলুন তো, আমি একটু হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি।'

'হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে না। মানুষের স্পর্শ এরা পছন্দ করে না।'

এমন দামী মাছ মানুষের মত মূল্যহীন প্রাণীর স্পর্শ পছন্দ করার কোন কারণ নেই। আমি ভদ্রলোককে এই অমূল্য প্রাণী দেখতে পাবার সৌভাগ্যের জন্যে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি বললেন, আসল জিনিস তো এখনো দেখেননি।

'আসল জিনিস কি?'

'আমার কুকুর। রাত বারোটার পর ছাড়া হয়। আসুন দেখবেন।'

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, ইউএস ডলারে আপনার কুকুরের দাম কত?

'ঠাট্টা করছেন নাকি ভাই?'

'জ্বি না, ঠাট্টা করছি না। সত্যি জানতে চাচ্ছি।'

'দামটা তো কোন ব্যাপার না। জিনিসটা কেমন সেটা হল কথা। আসুন আমার সঙ্গে।'

'একদিনে বেশি হয়ে যাচ্ছে, আরেক দিন এসে দেখে যাব।'

কুকুর না দেখেই আমি চলে এলাম।

এইসব বিপুল বিত্তের অধিকারীদের সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। এরা তাদের বিপুল বিত্তের অংশবিশেষ খরচ করবে, আমরা দেখে মুগ্ধ হব এই তো স্বাভাবিক। তবুও কোথায় যেন একটা ছোট্ট কাঁটা বিঁধে থাকে —। কি যেন খচ খচ করে।

একজনের একলক্ষ টাকা দামের পোষা মাছ থাকবে, আরেকজনের ঘরে অবোধ শিশু খেলনার জন্যে, ভাতের জন্যে কাঁদবে?

শুনেছি এই পৃথিবীতে যত খাদ্যশস্য হয় তা দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষ শুধু যে আরাম করে খাওয়া-দাওয়া করতে পারে তাই না, অনেক উদ্বৃত্তও থাকে। তবুও কেন এই গ্রহের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ রাতের বেলা অভুক্ত অবস্থায় ঘুমুতে যায়? আমি নিজে ক্ষুধার কষ্টের স্বরূপ জানি না, কিন্তু তীব্র অভাবে দিশেহারা মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে।

কুড়ি বছর আগের কথা। আমি তখন বাবর রোডে থাকি। আমাদের বাসার সামনে ছোট্ট দু'কামরার একটা টিনের ঘর। স্বামী-স্ত্রী এবং ছোট ছোট দু'টি বাচ্চার সংসার। একদিন শুনলাম, ভদ্রলোকের চাকরি চলে গেছে। কিছুদিন পর দেখা গেল, তারা তাদের সিলিং ফ্যান বিক্রি করে দিচ্ছে। তারপর খাট-পালং। একদিন মেয়েটি রুমালে বেঁধে তার বিয়ের চুড়ি আমাদের কাছে রেখে কিছু টাকা ধার করতে এল। সে কাঁদো কাঁদো গলায় আমার মাকে বলল, হারটা আমার মা'র স্মৃতিচিহ্ন। এই জন্যে বিক্রি করতে পারছি না। আপনি হারটা রেখে আমাকে পাঁচশ' টাকা দিন। যখন আমাদের টাকা হবে তখন টাকা দিয়ে হার ফেরত নেব। আমার মা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হার রাখতে হবে না। তুমি টাকা নিয়ে যাও আর মনে সাহস রাখো। খুব যখন অসুবিধেয় পড়বে আমার কাছে আসবে।

আমাদের নিজেদের অবস্থাও তখন শোচনীয়। দিনে আনি দিনে খাই অবস্থা। মেয়েটি প্রায়ই আসে। শেষের দিকে আর টাকা চাইতে আসতো না। ছোট্ট একটা বাটি নিয়ে রাত করে আসতো। মাটির দিকে তাকিয়ে বলতো, খালাম্মা, বাটিটাতে একটু ভাত আর ডাল দিন আমার মেয়ে দু'টির জন্যে।

এক সকালবেলা বাড়িওয়ালা তাদের বের করে দিল। আমি সকালবেলা বারান্দায় দাঁত মাজতে এসে দেখি, স্বামী-স্ত্রী তাদের পুরোনো বাসার গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জিনিসপত্র চারদিকে ছড়ানো। বাচ্চা দু'টি খুব কাঁদছে।

পৃথিবী নামক এই গ্রহের সবচে' বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ। কি প্রচণ্ড তার ক্ষমতা! একদিন সে জয় করবে অনন্ত নক্ষত্রবীথি, কিন্তু আজ তার একি পরাজয়!

পোর্ট্রেট

অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূরের বাসায় আমি মাঝে মাঝে যাই। তাঁর স্ত্রী খুব ভাল বেগুনভাজা রান্না করেন। বেগুনভাজার লোভে যাই বললে ভুল বলা হবে। খাদ্য হিসেবে বেগুন আমার তেমন প্রিয় নয়। তবে এই দম্পতির সঙ্গ প্রিয়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই নিতান্ত ভালমানুষ। আমার যে-কোন রসিকতায় এঁরা হো হো করে হাসেন। তাঁদের বাড়িটা ছোটখাটো একটা মিউজিয়ামের মত। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা ধরনের শিল্পকর্ম। দেয়ালে ঝুলছে অপূর্ব সব পেইনটিং। কিছু কিছু অতি বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা। ছবিগুলোও আমার বাড়তি আকর্ষণ। পেইন্টিং পুরোনো হয় না। একই ছবি বারবার দেখা যায়। আমি মাঝে মাঝে ছবি দেখার লোভেও যাই।

সেদিন তাঁদের বাসায় গিয়ে দেখি, দেয়ালে দাড়িওয়ালা এক বুড়োর পোর্ট্রেট। সেই বুড়োর একটা চোখ বন্ধ, একটা চোখ খোলা। মনে হয়, বুড়ো চোখ টিপ মারছে। পোর্ট্রেটের মানুষটিকে পরিচিত লাগছে। এর ছবি যেন আগেও কোথায় দেখেছি।

আমি নূরকে বললাম, ভাই এটা কার ছবি?

নূর এক বিখ্যাত শিল্পীর নাম করে বললেন, উনার আঁকা পোর্ট্রেট। উনি পোর্ট্রেট করেন না। এই প্রথম করলেন। ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেছি। সুন্দর না?

বিখ্যাত কারো আঁকা ছবি দেখলে বলতে হয়, খুব সুন্দর। না বললে বেকুব প্রমাণিত হবার ভয় থাকে। কাজেই আমি নূরের উত্তর এড়িয়ে জানতে চাইলাম, পোর্ট্রেটটা কার?

নূর অবাক হয়ে বললেন, কি আশ্চর্য! রবীন্দ্রনাথের ছবি। চিনতে পারছেন না কেন?

আমি হতভম্ব হয়ে রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে আছি। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের এমন এক ছবি দেখছি যেখানে তিনি চোখ টিপ মারছেন। আমি বললাম, নূর, আমি কি ভুল দেখছি? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, পোর্ট্রেটের রবীন্দ্রনাথ চোখ টিপ মারছেন। ব্যাপারটা কি তাই, না আমার মনের ভুল?

'আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

বিখ্যাত একজন শিল্পী ছবিটি এঁকেছেন। নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তে এঁকেছেন। চোখ টেপার ভেতর দিয়ে হয়তো তিনি মহা কোন ব্যাপার ধরে ফেলেছেন, যা আমি আমার স্বল্প বুদ্ধির কারণে ধরতে পারছি না। আমার সীমিত শিল্পবোধ আমাকে বলছে, এটি নিতান্তই অরুচিকর একটা ছবি। এই রসিকতা রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য নয়। মহারথী শিল্পীর রসিকতা হলেও নয়।

স্বয়ং পিকাসো যদি রবীন্দ্রনাথের চোখ টিপ-মারা ছবি আঁকেন তারপরেও আমি

বলব, অসুন্দর একটি ছবি। ছবিতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে। নূরের বাসা থেকে আমি মন খারাপ করে ফিরলাম। একবার ভাবলাম, আমার মন খারাপের ব্যাপারটা তাঁকে বলি। তাঁকে বলি যে, রবীন্দ্রনাথের সবচে' সুন্দর জিনিস হল তাঁর স্বপ্নময় চোখ। একজন বড় শিল্পীর চেষ্টা থাকবে সেই চোখের স্বপ্নকে ক্যানভাসে ধরা। তারপরই মনে হল, কি হবে বলে? নূর এই ছবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যে ঘরে ঝুলিয়ে রাখেননি। ছবিটি রেখেছেন একজন বড় শিল্পীর শিল্পকর্মের নিদর্শন হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ চোখ টিপি দিক কিংবা জিহ্বা বের করে থাকুক কিছু যায় আসে না।

আমি ঠিক করলাম, আর কোনদিনই নূরের বাসায় যাবো না। তাঁর বাসায় গেলেই ছবিটির দিকে চোখ যাবে, মনটা হবে খারাপ। কি দরকার?

এই পৃথিবীতে অল্প কিছু মানুষ আছেন যাঁরা অন্ধকার রজনীতে আলো জ্বেলে সবাইকে পথ দেখান। মানুষ যখন হতাশাগ্রস্ত হয়, তাঁরা বলেন, সম্মুখে শান্তি পারাবার, যখন সে পরাজয়ের মুখোমুখি হয় তখব তাঁরা কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বলেন, **Man can be destroyed but not defeated.** এঁদের প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধাও আমাকে পীড়া দেয়।

সমস্যা হল, আমরা কোন এক বিচিত্র কারণে সম্মানিত মানুষের সম্মানহানি করে এক ধরনের আনন্দ পাই। এক রবীন্দ্র গবেষক আমাকে ফিসফিস করে বলেছিলেন, আমার কাছে সিরিয়াস মেটেরিয়েল আছে। প্রকাশ হলে কবিগুরু ফ্লাট হয়ে মাটিতে পড়ে যাবেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন তাঁদের এক কর্মচারীর মেয়েকে। চিন্তা করে দেখুন, জমিদারের ছেলে বিয়ে করেছেন তাঁদের এক কর্মচারীর মেয়েকে। সেই মেয়ের না আছে রূপ, না আছে গুণ। তাহলে কেন এই বিয়ে? আমি প্রমাণ করে দিতে পারি যে, তিনি বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর উপায় ছিল না। 'কেলেংকেরিয়াস' ব্যাপার।

গবেষকের আনন্দোজ্জ্বল চোখ দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেবেছি, হায় রে! আমরা এমন কেন? চন্দ্র দেখলেই আমরা কেন কলঙ্ক দেখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ি? কি আছে কলঙ্কে?

মজার ব্যাপার হল, এই আমরাই আবার বাড়াবাড়ি ধরনের ভক্তি দেখাতেও ভালবাসি। সেই ভক্তিও অশ্রদ্ধার মতই। উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করি। ২২শে শ্রাবণ উপলক্ষে বাংলা একাডেমীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপূর্ব সব গান শুনছি। গভীর আবেগে চোখ ভিজে উঠেছে। এমন সময় এব ভদ্রলোক আমার কাছে এগিয়ে এলেন। (তাঁর নাম বললে আপনারা তাঁকে চিনে ফেলতে পারেন, কাজেই নাম বলছি না) তিনি আমাকে দেখে গম্ভীর গলায় বললেন, হুমায়ূন, আপনি কি জানেন রবীন্দ্রনাথ হলেন আমার ঈশ্বর। আমি তাঁর আরাধনা করি।

আমি ভদ্রলোকের কথায় চমৎকৃত হলাম। তিনি আবেগকম্পিত গলায় বললেন, আমার যাবতীয় প্রার্থনা তাঁর কাছে। ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি গেলাম হকচকিয়ে।

সহজ গলায় বললাম, ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ বেঁচে নেই। তিনি বেঁচে থাকলে খুব বিরক্ত হতেন।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, আপনার এই কথার মানে কি?

আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান একজন মানুষ। মানুষের বোকামিতে তিনি সবসময়ই বিরক্ত হতেন।

আপনি কি আমাকে বোকা বলার চেষ্টা করছেন?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ইয়েস স্যার।

তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, রবীন্দ্রনাথের রচনা আপনি পড়েননি। আর পড়লেও তার মর্ম বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই। থাকলে আপনিও তাঁর আরাধনা করতেন।

ভদ্রলোকের রাগ আর বাড়াবার সাহস আমার হল না। একটা কথা মুখে প্রায় এসে গিয়েছিল, প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম — রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে যাদের পরিচয় সবচেয়ে কম, শুধু তারাই তাঁকে ঈশ্বরের পর্যায়ে নিয়ে যায়। এতে তাঁকে বড় করা হয় না, ছোট করা হয়।

আমি কিছু বললাম না। মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

আমাদের পরম সৌভাগ্য, এত বড় মাপের একজন মানুষকে আমরা নিজেদের মধ্যে পেয়েছি। যিনি তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে একাই ১০০ বছর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। জীবনের গভীরতম বোধকে আমাদের উপলব্ধির কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন অবলীলায়। সেই তাঁকে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হিসেবে কাছে না টেনে ঈশ্বর হিসেবে দূরে সরিয়ে দেয়াটা হাস্যকর ব্যাপার নয় কি? হাস্যকর ব্যাপারগুলি আমরা এত আগ্রহ নিয়ে কেন করি?

আমি একবার মজা করে লিখেছিলাম, মানুষ হচ্ছে এমন এক বুদ্ধিমান প্রাণী যে বেশিরভাগ কাজই করে বোকার মত। আজকাল প্রায়ই মনে হয়, এটাই বোধহয় সত্যি। বোকার মত কাজ করার জন্যেই হয়তো বুদ্ধিমান এক প্রাণী সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।**

** পত্রিকায় দেয়ার আগে নূরকে আমি রচনাটা পড়ে শোনালাম। শুরুতে তাঁর মুখ খুব হাসি হাসি থাকলেও, শেষটায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, নন্দনতত্ত্ব ব্যাখ্যায় হুমায়ূন আহমেদের বক্তব্য গ্রহণ করতে হবে, তা কে বলল?

মৃত্যু

তাঁর পেটে ক্যানসার। দু'বার অপারেশন হয়েছে। প্রথমবার দেশে, দ্বিতীয়বার কোলকাতায়। লাভ কিছু হল না। অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগলো। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো ব্যাঙ্ককের আমেরিকান হাসপাতালে। সেখানকার চিকিৎসা না-কি ভাল। অনেক সময় এমন হয়েছে, দেশের ডাক্তাররা বলেছেন ক্যানসার — ওখানে গিয়ে দেখা গেছে অন্য কিছু।

তিনিও হয়ত তেমন কিছু আশা করছিলেন। কিন্তু ব্যাঙ্ককের ডাক্তাররা বিনয়ের সঙ্গে বললেন, রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। এখন শুধু যন্ত্রণা কমানোর চেষ্টাই করা যাবে। আর কিছু না।

তিনি হতভম্ব হয়ে ডাক্তারদের কথা শুনলেন। পাশে দাঁড়ানো তাঁর বড় ছেলের দিকে তাকিয়ে নেত্রকোনার ডায়ালেক্টে বললেন — 'নাক চেপ্টা ডাক্তার, এইতা কি কয়?'

ছেলে বলল, বাবা, তুমি কোন চিন্তা করবে না। আমি তোমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাব। যে চিকিৎসা কোথাও নেই — সেই চিকিৎসা আমেরিকায় আছে।

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, গাধার মত কথা বলিস না। আমেরিকার মানুষ বুঝি ক্যানসারে মরে না? চল দেশে যাই। মরণের জন্য তৈয়ার হই।

ভদ্রলোক মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন।

গল্প-উপন্যাসে এরকম চরিত্র পাওয়া যায়। অমোঘ মৃত্যুর সামনেও দেখা যায় গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররা নির্বিকার থাকে। একটা হিন্দী ছবিতে দেখেছিলাম, নায়ক জানতে পেরেছে ক্যানসার হয়েছে। অল্প কিছুদিন বাঁচবে। জানবার পর থেকে তার ধেই ধেই নৃত্য আরো বেড়ে গেল। কথায় কথায় গান। কথায় কথায় হাসি।

বাস্তব কখনোই সেরকম নয়। বাস্তবের অসীম সাহসী মানুষও মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারেন না। মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করা তো অনেক দূরের ব্যাপার —

আমরা বেঁচে থাকতে চাই। শুধুই বেঁচে থাকতে চাই। যখন শেষ সময় উপস্থিত হয় তখনো বলি — দাও দাও। আর একটি মুহূর্ত দাও। দয়া কর।

'গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায় অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।'
(আট বছর আগে একদিন)

যে জীবনের জন্যে আমাদের এত মোহ, এত ভালবাসা, সেই জীবনটা যে কী তাই

কি আমরা জানি? নিঃশ্বাস নেয়া, খাওয়া এবং ঘুমানো? না কি তার বাইরেও কিছু?

তত্ত্বকথায় না গিয়ে আগের জায়গায় ফিরে যাই। যে ভদ্রলোকের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, তাঁর কাছে যাওয়া যাক। ভদ্রলোক শিক্ষকতা করেন। প্রাইভেট কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়ান। তাঁর সারাজীবনই কষ্টে কষ্টে গেছে। শেষ সময়ে একটু সুখের মুখ দেখলেন। একজন ছেলে সরকারী কলেজে শিক্ষকতার কাজ পেল। আরেক ছেলে ব্যবসাতে ভাল টাকা পেতে লাগল। একমাত্র মেয়েটি মেডিক্যাল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে আছে —। এমন সুখের সময় সব ছেড়ে ছুটে চলে যাবার চিন্তাটাই তো অসহনীয়।

তারচেয়েও বড় কথা, তাঁর যাত্রা এমন এক ভুবনের দিকে যে ভুবন সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। সঙ্গী-সাথীও কেউ নেই যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভদ্রলোক মৃত্যুর প্রস্তুতিপর্ব শুরু করলেন অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে। এরকম ভঙ্গি যে থাকা সম্ভব তাই আমি জানতাম না।

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। ধরেই নিয়েছি, মৃত্যুভয়ে ভীত একজন মানুষকে দেখব, যিনি ডুবন্ত মানুষের মত হাতের কাছে যাই দেখছেন তাই ধরার চেষ্টা করছেন। যা ধরতে যাচ্ছেন তাও ফসকে ফসকে যাচ্ছে।

গিয়ে দেখি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। ভদ্রলোক শুয়ে আছেন ঠিকই, কিন্তু মুখ হাসি হাসি। তাঁর হাতে কি-একটা ম্যাগাজিন। তিনি আমাকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলেন।

'আরে আরে, মিসির আলি চলে এসেছে!'

আমি বললাম, কেমন আছেন?

'খুবই খারাপ আছি। টাইমলি এসেছো। আর কিছুদিন পরে এলে দেখা হত না। ডাক্তার বলে দিয়েছে, আর বড়জোর একমাস।'

'আপনাকে দেখে কিন্তু ভাল লাগছে।'

'ভাল লাগারই তো কথা। চেহারা তো কোনদিন খারাপ ছিল না। হা হা হা।'

আমি রীতিমত হকচকিয়ে গেলাম। কি নিয়ে আলাপ করব তাও বুঝতে পারছি না। মৃত্যুকে শিয়রে নিয়ে যিনি বসে আছেন তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই নাটক নিয়ে কথা বলা যায় না।

আমি বললাম, এখন চিকিৎসা কি হচ্ছে?

তিনি গলার স্বর নামিয়ে বললেন, সবরকম চিকিৎসা চলছে। আধিভৌতিক চিকিৎসাই বেশি চলছে। বর্তমানে একজন জ্বীন-ডাক্তার আমার চিকিৎসা করছেন।

'কে চিকিৎসা করছেন?'

'জ্বীন। জ্বীনদের মধ্যেও ডাক্তার-কবিরাজ আছে। তাঁদেরই একজন।'

'বলেন কি!'

'যে যেখানে যা পাচ্ছে ধরে নিয়ে আসছে। কবিরাজ, পানিপড়া, মন্ত্র-তন্ত্র সব চলছে। একজন বালক-পীরের সন্ধান পাওয়া গেছে। বয়স নয় বছর। টাঙ্গাইলে থাকে। সে তেলপড়া দিয়েছে। সেই তেলপড়াও পেটে মালিশ করলাম।'

'কোন লাভ হচ্ছে কি?'

'লাভ হবে কোত্থেকে? অনেকের ভাল ব্যবসা হচ্ছে। তবে আমি আপত্তি করছি না। যে যা করতে বলছে, করছি। অনেকে আবার বোকার মত জিজ্ঞেস করে — কি খেতে মনে চায়? আমি রাগ করতে গিয়েও রাগ করি না। কি হবে রাগ করে? আমি খাবারের নাম বলি — যা খুব সহজে পাওয়া যায় না — আবার একেবারে দুষ্প্রাপ্যও নয়। যেমন একজনকে বললাম, চালতার আচার খেতে ইচ্ছা করছে। সে অনেক খুঁজে-পেতে এক হরলিক্সের টিন ভর্তি চালতার আচার নিয়ে এল। এবং এই আচার খুঁজে বের করতে তার যে কি কষ্ট হয়েছে সেটা সে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বলল।'

ভদ্রলোক কথ বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমি বললাম, আপনি আর কথা বলবেন না, বিশ্রাম করুন। আমি আবার আসব।

তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন, এসো। এখন কথা বলতে এবং কথা শুনতে ভাল লাগে। আমি ইন্টারেস্টিং কিছু শুনতে চাই। কেউ ইন্টারেস্টিং কিছু বলতে পারে না। সবাই আমার কাছে এখন আসে তাদের সবচে' বোরিং গল্পটা নিয়ে।

আমি চলে এলাম। চার-পাঁচ পর দিন তাঁর ছেলে আমাকে এসে বলল, বাবার শরীর খুব খারাপ করেছে। আপনাকে শেষ দেখা দেখতে চায়।

আমি তৎক্ষণাৎ গেলাম। ভদ্রলোকের মুখ এখনো হাসি-হাসি। আমি বললাম — কেমন আছেন?

তিনি উত্তর দিলেন না। সম্ভবত এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁর ইচ্ছা করছে না। আগেরবার আমার সঙ্গে আধশোয়া হয়ে গল্প করছিলেন — এবার শুয়েই রইলেন। ছেলেকে বললেন পাশ ফিরিয়ে দিতে। ছেলে পাশ ফিরিয়ে দিল। তিনি ক্ষীণ গলায় বললেন, যাত্রার সব আয়োজন সম্পন্ন করেছি। একটা ইচ্ছা ছিল — আমার স্কুলের সব ছাত্রদের একবেলা দাওয়াত করে খাওয়াব — সে ইচ্ছাও পূর্ণ হচ্ছে। শনিবার দুপুরে এরা খাবে।

'বাহ, ভাল তো'!

'তুমি এসো শনিবারে। তোমাকে দাওয়াত করছি না। দেখার জন্যে আসবে। ঐদিন শুধু বাচ্চাদের দাওয়াত।'

'জ্বি, আমি আসব।'

তিনি অল্প খানিকক্ষণ কথা বলার পরিশ্রমেই হাঁপাতে লাগলেন। আমি বসে রইলাম। বিস্তর লোকজন আসছে-যাচ্ছে। অধিকাংশই কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলছে। তিনি সবার সঙ্গেই সহজভাবে একটা-দুইটা করে কথা বললেন। আমাকে নিচু গলায় বললেন, আল্লাহ পাক নিজেই মনে হয় সব মানুষকে মৃত্যুর জন্যে তৈরি করেন। এখন আর মানুষের সঙ্গ আমার ভাল লাগে না, অথচ কয়েকদিন আগেই অন্য ব্যাপার ছিল।

'মৃত্যুর জন্যে আপনি তাহলে তৈরি?'

'হ্যাঁ।'

'ভয় লাগছে না?'

'লাগছে। আবার এক ধরনের কৌতূহলও হচ্ছে। এই প্রথমবার আমি এমন একটা জিনিস জানব যা তোমরা কেউই জান না। মৃত্যু কি সেটা জানা যাবে। ঠিক না?'

'জ্বি ঠিক।'

'একটা মজার ব্যাপার কি লক্ষ্য করেছ — জন্ম সময়ের স্মৃতি মানুষ অন্যকে বলতে পারে না, আবার মৃত্যুর কথাও বলতে পারে না। জন্ম-মৃত্যু দু'টা স্মৃতিই এমন -- যা অন্যকে দেয়া যায় না। দু'টোই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্মৃতি।'

'ঠিকই বলেছেন।'

অসুস্থ মানুষের সামনে বসে চা খাওয়া যায় না। আমাকে খেতে হল। তিনি চা না খাইয়ে ছাড়বেন না। চলে আসবার সময় হঠাৎ বললেন — তুমি জিজ্ঞেস করছিলে ভয় লাগছে কি-না। হ্যাঁ লাগছে, প্রচণ্ড লাগছে। তবে এক ধরনের ভরসাও পাচ্ছি।

'ভরসা পাচ্ছেন কেন?'

'ভরসা পাচ্ছি, কারণ পবিত্র কোরান শরীফে কয়েকটা অসাধারণ আয়াত আছে। ঐ আয়াতগুলি থেকে ভরসা পাচ্ছি। তুমি তো লেখালেখি কর — কোন এক ফাঁকে এই আয়ত ক'টা ঢুকিয়ে দিও। এতে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষরা ভরসা পাবে।'

আমি বললাম, আয়াত ক'টি বলুন আমি লিখে নিচ্ছি।

'সুরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত ৮৪ ও ৮৫ —

একজন মানুষ যখন মারা যায়—

তোমরা তখন তাকে ঘিরে বসে থাক।

কিন্তু তোমরা জান না,

তোমরা ঐ মৃত্যুপথযাত্রীর যতটা কাছে বসে থাক আমি তারচেয়েও অনেক কাছে থাকি।'

ভদ্রলোক শান্তস্বরে বললেন — মৃত্যুর সময় পরম করুণাময় যদি আমার পাশে থাকেন, তা হলে আর ভয় কি?

ধন্য ! জন্মেছি এই দেশে

আমার বড় মেয়ে পড়ে হলিক্রস কলেজে। একেকটা কলেজের মেয়েরা একেক ধরনের হয়। হলিক্রস কলেজের মেয়েদের ভেতর ইংরেজি ভাবটা খুব প্রবল। কাজেই আমার বড় মেয়ে যখন আমাকে এসে বলল, তার ইচ্ছা বাসায় একটা স্লাম্বার পার্টি দেয়, তখন আমি তেমন বিস্মিত হলাম না। শুধু ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলাম, স্লাম্বার পার্টি ব্যাপারটা কি? জানা গেল, স্লাম্বার পার্টি হচ্ছে কিছু বান্ধবী একত্র হয়ে হৈ-চৈ করবে এবং রাতে এক বিছানায় ঘুমুবে। আমি অতিরিক্ত রকমের উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, স্লাম্বার পার্টি খুব প্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার। নিশ্চয়ই এতে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। তুমি এই পার্টি করতে চাচ্ছ শুনে ভাল লাগল। তা এই পার্টিটা কবে হচ্ছে?

আমার কন্যা বেণী দুলিয়ে বলল, পার্টি হবে নিউ ইয়ার্স ইভে। সারারাত আমরা ঘুমুব না।

নিউ ইয়ার্স ইভ বললে আমরা ডিসেম্বরের ৩১ তারিখ বুঝে থাকি। এখন এপ্রিল মাস, এক বছর আগে দিনক্ষণ ঠিক হচ্ছে কেন বুঝতে পারলাম না। জানা গেল, এই নিউ ইয়ার্স ডে হল বাংলা নববর্ষ, পহেলা বৈশাখ। আমার কন্যা তার বান্ধবীদের নিয়ে বাংলা নববর্ষ বরণ করবে। পায়ে আলতা পরবে, চুলে গুঁজবে সাদা রং-এর ফুল। কন্যার এক বান্ধবী সম্প্রতি চুল কেটে পাংকু হয়েছে। বাংলা নববর্ষের উৎসবে তো আর পাংকু সেজে যাওয়া যায় না, কাজেই সে সিঙ্গাপুর থেকে নকল চুল আনিয়েছে। সেই চুল হাঁটু পর্যন্ত নেমে যায়। খাঁটি বঙ্গললনা হবার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। আমার পবিত্র দায়িত্ব হল, এদের সবাইকে সূর্য ওঠার আগে রমনা বটমূলে নিয়ে যেতে হবে। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা হল। সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে ওঠা আমার কাছে এক ধরনের ক্রাইম বলে মনে হয়। ঠিক সময়ে ওঠা সূর্যের জন্য খুব জরুরী, আমার জন্যে নয়। তার চেয়েও বড় কথা, পহেলা বৈশাখের যে নাগরিক উৎসব ঢাকায় চালু হয়েছে তা আমাকে আগের মত আর আকর্ষণ করে না ।

'উৎসব' শব্দটা মাথায় এলেই যে ছবি আমার চোখে ভাসে সে ছবি হৈচৈ-এর ছবি। ভেঁপু বাজানোর ছবি, নাগরদোলার ছবি। ঢাকা শহরের নাগরিক রমনা বটমূলকেন্দ্রিক পহেলা বৈশাখের উৎসব মোটেই সেরকম না। বলা যেতে পারে সিরিয়াস টাইপের উৎসব, যার নিয়মকানুন বেশ কড়া। রিচুয়েলের দিক থেকে বিচার করলে এই উৎসব খানিকটা ধর্ম উৎসবের মত। সূর্য ওঠার আগেই উপস্থিত হতে হয়। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 'ছায়ানটের' শিল্পীরা গান ধরেন — এসো হে বৈশাখ। উদ্বোধনী এই গানের পর একের পর এক রবীন্দ্র সংগীত চলতে থাকে। অন্য কোন গান নয়। শ্রোতাদের গম্ভীর ভাব করে গান শুনতে হয়। কারো ভেতর সামান্যতম তারল্য ভাব দেখা গেলে

আশেপাশের সবাই কঠিন চোখে তাকায়। যে দৃষ্টির অর্থ — এই অসংস্কৃত গাধা কোত্থেকে এসেছে? প্রচণ্ড ভিড়ে ঠেলাঠেলি করতে করতে রবীন্দ্র সংগীত শুনতে ভাল লাগে না।

গানপর্ব শেষ হবার পরের অংশটা অবশ্যি বেশ মজার। নগরবাসী আধুনিক বঙ্গসন্তানরা তখন খাঁটি দেশীয় খাবারের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। উৎসব উপলক্ষে গজিয়ে ওঠা খাবারের দোকানের সামনে ভিড় করেন। শানকিতে পান্তাভাত, পোড়া মরিচ দেয়া হয়। নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে সেই প্রচণ্ড ঝাল পান্তাভাত খেতে খেতে এক একজন ঘোর-লাগা গলায় বলেন, আহা রে, কি অপূর্ব খাবার। ধন্য জন্মেছি এই দেশে।

আমার লেখা থেকে মনে হতে পারে, আমি বোধহয় বটমূলের নববর্ষ আবাহনী উৎসবকে তুচ্ছ করার চেষ্টা করছি। একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে সস্তা রসিকতা করার চেষ্টা করছি। তা কিন্তু নয়। এই উৎসব এখন আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসবের একটি। একে তুচ্ছ করার কোন উপায় নেই। কেন, তা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি।

এই বাংলায় পহেলা বৈশাখ কখনোই আনন্দময় উৎসবের কোন দিন ছিল না। জমিদাররা এই দিনে পুণ্যাহ করতেন। সেই পুণ্যাহ জমিদারের খাজনা আদায়ের উৎসব। প্রজাদের জন্য সুখকর কিছু না। ব্যবসায়ীরা করতেন হালখাতা। সেখানেও সাধারণদের ভূমিকা হল বকেয়া টাকাপয়সা দেয়া। নতুন বৎসর তাদের কাছে আনন্দ নিয়ে আসে না। আসে আশংকা নিয়ে — না জানি কেমন যাবে সামনের দিন! তাছাড়া কিছুদিন আগেই হয়ে গেছে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা। আর কেন? বৈশাখ মাস উৎসবের জন্য আদর্শ নয়। আছে কালবোশেখী, শিলাবৃষ্টি। এই মাসে কৃষকদের কাজের চাপও প্রচণ্ড। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই, উৎসব তো অনেক পরের ব্যাপার।

এদেশে বাংলা নববর্ষ পালনের ধারণাটা পশ্চিম থেকে পাওয়া। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকরা নওরোজ করতেন। তবে তার প্রভাবে এদেশে বাংলা নববর্ষ পালন শুরু হয়নি। রাজা-বাদশাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশের মানুষ কিছু করে না। বর্ষপালন প্রক্রিয়া শুরু করলেন আধুনিক কিছু মানুষ, তাও বিচ্ছিন্নভাবে ঘরোয়া ভঙ্গিতে। পঞ্চাশ দশকের দিকে কবি বেগম সুফিয়া কামালের তারাবাগের বাসভবনে পহেলা বৈশাখ পালিত হত। কবি জাহানারা আরজুর বাসভবন কবিতাঙ্গনে বাংলা নববর্ষ বেশ ঘটা করে করা হত।

ভাষা আন্দোলনের পর পর আমাদের চিন্তা-ভাবনায় কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। প্রয়োজন হয়ে পড়ল স্বকীয়তা অনুসন্ধানের। আমরা বাঙালীরা আলাদা, এটা যেমন নিজেদের জানার দরকার হয়ে পড়ল, অন্যদেরও জানানোর প্রয়েজনীয়তা দেখা দিল। রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করার পাঁয়তারাও তখন চলছে, এটা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। প্রতিবাদের অস্ত্র হিসেবেও প্রয়োজন হল রবীন্দ্র সংগীতের। ১৯৬৭ সনে প্রথম এগিয়ে এল 'ছায়ানট', রমনা বটমূলে রবীন্দ্র সংগীত দিয়ে আবাহন করা হবে বাংলার নতুন বছরকে। এই আবাহন বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। যোগ দিলে হাজারো মানুষ। যে

নাগরিক উৎসবের পেছনের ইতিহাস এত গৌরবের তাকে ছোট করে দেখা নিজেকেই ছোট করে দেখা।

যতই দিন যাচ্ছে এই উৎসবের ব্যাপকতা ততই বাড়ছে। স্বাধীনতার পর পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা দিলেন। উৎসবপালনে এগিয়ে এল অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত উৎসব। বাংলা একাডেমীতে লোক উৎসব, শিশু একাডেমীর মেলা, বিসিকের মেলা, পুরানো ঢাকার ধূপখোলা মাঠে তিনদিন ধরে বৈশাখী মেলা। দু'তিন বছর হল এই দিনে আর্ট কলেজের ছেলেমেয়েরা বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করা শুরু করেছেন। সে এক দেখার মত দৃশ্য। বিচিত্র সব মুখোশ, রংচংয়ে পোশাক, বাদ্য-বাজনা — সে এক হুলুস্থূল ব্যাপার। মিছিল যখন বের হয় তখন ইচ্ছা করে মজাদার একটা মুখোশ পরে আমিও ওদের মত নাচানাচি করি। নানান কারণে তা করা হয় না। মুখ শুকনো করে বলতে হয়, আচ্ছা, এরা শুরু করেছে কি?

গত বছর নববর্ষের আগের দিনটিতে আমি ছিলাম কোলকাতায়। বাংলাদেশ মিশনের আয়োজিত গ্রন্থমেলার অতিথি। ভাবলাম, এসেছি যখন কোলকাতার পহেলা বৈশাখের উৎসবটা দেখেই যাই, তাছাড়া, তখন ১৪০০ সাল পূর্তি উপলক্ষে অনেক কিছু হচ্ছে। বাংলাদেশ মিশনের সঙ্গে কথা বলে আরো দু'দিন থাকার ব্যবস্থা হল। তারপরেই মনে হল, আরে কি করছি? বাংলা নতুন বছরে আমি রমনা বটমূলের আশেপাশে থাকব না, তা কি করে হয়? সূর্য ওঠার আগে অবশ্যই উঠতে হবে। গান শুনতে হবে, মাটির শানকিতে করে পান্তাভাত খেতে হবে পোড়া মরিচ মাখিয়ে। একদিনের বাঙালী বলে অনেকেই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে, করুক। আমি আগুন-ঝাল পান্তা খেতে খেতে, বৈশাখের কড়া রোদে পুড়তে পুড়তে বলব, ধন্য! জন্মেছি এই দেশে।

ভূতের পা

আমরা তখন কুমিল্লায় থাকি।

বাবা পুলিশের ডিএসপি। আমাদের বাসা ঠাকুরপাড়ায়। এক রাতের কথা। গভীর উৎকণ্ঠায় সবাই জেগে বসে আছি। মা জায়নামাজে তসবি পড়ে যাচ্ছেন। আমরা দোতলার বারান্দায়। গাড়ির শব্দ কানে এলেই চমকে উঠছি। আমাদের এই শংকিত প্রতীক্ষার কারণ আমার বাবা। তিনি পুলিশ ফোর্স নিয়ে গেছেন হোমনায়। সেখানে এর আগের দিন একজন এএসআই এবং দু'জন পুলিশ কনস্টেবলকে গ্রামবাসী ধরে নিয়ে গেছে। এরা আসামী গ্রেফতার করে ফিরছিল। গ্রামবাসী আসামীদের ছিনিয়ে নেয় এবং পুলিশদেরও ধরে নিয়ে যায়। আজকের অভিযান ওদের উদ্ধার করে আনা।

রাত তিনটায় বাবা ফিরলেন।

মা সঙ্গে সঙ্গে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়লেন। বাবার সঙ্গে আমাদের এক ধরনের দূরত্ব ছিল — আমরা সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না। মা'র কাছ থেকে জানলাম, পুলিশদের উদ্ধার করা হয়েছে। তবে ওদের রাইফেল পাওয়া যায়নি। একজন পুলিশের অবস্থা খুবই খারাপ। তাকে কুমিল্লা মিলিটারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে।

বাবা রাত সাড়ে তিনটায় রাতের খাবার খেতে বসলেন। খেতে পারলেন না। কিছুক্ষণ ভাত নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লেন এবং বিষণ্ণ গলায় বললেন, পুলিশের চাকরি করব না। বাবা তাঁর দীর্ঘ চাকরিজীবনে অসংখ্যবার বলেছেন — পুলিশের চাকরি করব না। তারপরও তাঁকে এই চাকরি করতে হয়েছে। তাঁর সংসারের দিকে তাকিয়ে করতে হয়েছে।

চাকরির কারণে তাঁকে যেমন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, আমাদেরও ভোগ করতে হয়েছে। সবচে' বেশী ভোগ করতে হয়েছে আমার মা'কে। স্বামীর দুশ্চিন্তায় এই মহিলার কেটেছে দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী।

আমার মা'র ধর্মকর্মের বড় অংশই নিবেদিত ছিল আমার বাবার মঙ্গলকামনায়। বাবা বাসায় নেই — গভীর রাত্র — মা কোরানশরীফ নিয়ে একমনে পড়ে যাচ্ছেন — ফাবিআয়ে আলাএ রাব্বিকুমা তুকাজ্‌জিবান। এ ছিল আমাদের অতি পরিচিত দৃশ্যের একটি।

পুরানো প্রসঙ্গ মনে পড়ল পত্রিকায় নিহত পুলিশ অফিসারের ঘটনা পড়ে। তাঁর নবজাত শিশুপুত্রটির ছবিও দেখলাম। আহা, কী সুন্দর ছেলে! আমার দ্বিতীয় কন্যার জন্মসময়ে তোলা ছবিটিও অবিকল এই রকম। তফাৎ এইটুকু — জন্মের পরপরই আমি আমার কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পেরেছিলাম। ফরহাদ সাহেবের এই

সৌভাগ্য হল না।

মৃত্যুতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কোন মৃত্যুই এখন বোধহয় আমাদের তেমন স্পর্শ করে না। কিন্তু এই মৃত্যু আমাদের স্পর্শ করেছে। কেন করল? পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী দল। এদের বিপজ্জনক জীবনযাপন করতেই হবে। চাকরির শর্তই তাই। তারপরেও এই মৃত্যু আমাদের এতটা ব্যথিত কেন করল? তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর কথা ভেবে? তাঁর অবোধ শিশুটির কথা ভেবে?

পত্রিকায় খবরটা পড়ে আমার প্রথমেই মনে হল, আহা, এই মানুষটি বোধ হয় এখনো ঈদের বাজার করেননি। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে ঈদের বাজার করার দিনক্ষণ শুধু করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী মিলে ঠিক করে রেখেছেন, এবার ঈদে নতুন শিশু যে এখনো পৃথিবীতে আসেনি তার জন্যেও কাপড় কেনা হবে। ছেলে হচ্ছে কি মেয়ে হচ্ছে যেহেতু জানা যাচ্ছে না — সেহেতু দু'সেটই কেনা হবে।

যাদের জন্যে এমন এক দুঃখ গাথা তৈরি হল তারা এখন কোথায়? কি করছে তারা? যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা তারা আর কতদিন খেলবে? যারা তাদের দিয়ে এই খেলা খেলছেন-তাঁরা কবে জানবেন — প্রতিটি মানুষকে হিসাব দিতে হয় তার নিজের কড়িতে — ইংরেজিতে আরো সুন্দর করে বলা হয় — **Everybody is paid back by his own coin.**

এ দেশে সন্ত্রাস কি বন্ধ হবে? যদি হয় তবে কতদিন লাগবে সন্ত্রাস বন্ধ করতে? এক বছর, দু'বছর, পাঁচ বছর? একজন পুলিশ অফিসার আমাকে বলেছিলেন, খুব বেশি সময় লাগলে এক মাস লাগবে। আমরা প্রতিটি সন্ত্রাসীকে চিনি। তারা কোথায় থাকে জানি। কাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ তাও জানি। কিন্তু এদের ধরা যাবে না। ধরলেও দ্রুত ছেড়ে দিতে হবে।

আমি সেই পুলিশ অফিসারকে বলেছিলাম, আপনারা এক কাজ করুন না কেন — আপনাদের কাছে সন্ত্রাসীদের যে তালিকা আছে, সেই তালিকা খবরের কাগজে ছেপে দিন — তারপর আমরা দেখব কারা তাদের আশ্রয় দেন।

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। সম্ভবত আমি হাস্যকর কিছু বলেছিলাম। পুলিশ ইচ্ছা করলে কি সন্ত্রাস দূর করতে পারে? তাদের কি সেই সদিচ্ছা আছে? আমার কিন্তু মনে হয় না। দীর্ঘদিন আমি শহীদুল্লাহ্ হলের হাউস টিউটর ছিলাম। সেই সময়ে প্রায় হল রেইড হত। পুলিশ হল ঘিরে ফেলত। তখন দেখেছি, হলের যেসব ছেলেদের আমি সন্ত্রাসী হিসাবে চিনি, যারা প্রকাশ্যেই বন্দুক হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা বন্ধুর মত পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে ঘুরছে। অমুক ভাই, তমুক ভাই বলে ডাকছে। আমরা যারা হল প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তারাও কি সন্ত্রাস নির্মূলে সাহসী ভূমিকা কখনো রাখতে পেরেছি? আমার মনে হয় না। একটা ঘটনা বলি — একবার শহীদুল্লাহ্ হলের এক ছাত্র আমাকে গোপনে একটা খবর দিল। কোন একটা ঘরে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি আমার প্রভোস্টকে তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা জানালাম এবং

বললাম ব্যবস্থা নিতে। প্রভোস্ট স্যার আমাকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন — "হুমায়ূন, তুমি এত অল্পতে উত্তেজিত হও কেন? চুপ থাক তো।"

বর্তমান সময়ের একটাই বোধহয় স্লোগান — "চুপ করে থাকো।" আমরা চুপ করে থাকব। আমরা কথা বলতে পারব না।

কিন্তু আর কতদিন?

একটা কিছু করার সময় কি আসেনি?

বলা হয়ে থাকে, যে একবার বন্দুক হাতে নেয়, সে হাত থেকে বন্দুক নামাতে পারে না। বন্দুক নামালেই তাঁর জীবন সংশয়। এই ব্যাপারটিও না হয় ভেবে দেখা যাক। ভুল পথে যাওয়া যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর পথ খোঁজা যাক। সমাজবিদরা ভেবে দেখুন, কি করলে এরা ঠিক হবে। শাস্তির ভয়ে এরা কাবু হবার নয়। জীবন-মৃত্যু খেলা যারা খেলে, তারা এত সহজে ভড়কায় না। এদের জন্যে নতুন করে ভাবতে হবে। সেই ভাবনা সবাই মিলে ভাববেন, এটা আশা করা অন্যায় নিশ্চয়ই নয়।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি — সবার জন্যে স্বাস্থ্য, সবার জন্যে শিক্ষা . . . খুব ভাল কথা, কিন্তু সবচে' জরুরী কথা স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা। সেই নিশ্চয়তা সম্পর্কে কঠিন পদক্ষেপ কি আমরা কোনদিন নেব না?

পুলিশ অফিসার ফরহাদ সাহেবের মৃত্যুর পর সংসদে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে জেনে আনন্দিত হলাম। শোক প্রস্তাব নিতে তো এখন ঘেন্না লাগার কথা! শোক প্রস্তাবের বাইরে আমরা কি করছি? আসলেও কিছু করার ইচ্ছা কি আমাদের আছে?

নিহত পুলিশ অফিসারের সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুসন্তানটির মায়াকাড়া মুখ দেখে বেদনায় অভিভূত হয়েছি। এই ছেলেটি বড় হয়ে যখন প্রশ্ন করবে — কারা মারল আমার বাবাকে? কেন মারল? তখন আমরা কি জবাব দেব?

দেশে এখন জনগণের নির্বাচিত সরকার। এই সরকারের কাছে আমাদের অনেক দাবি, অনেক প্রত্যাশা। কারণ আমরা এই সরকারকে নির্বাচিত করেছি। সরকারের কাছে আমরা স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা চাইছি। জানি, এই কাজ সহজ নয়। সরকারের হাতে আলাদীনের যাদুপ্রদীপ নেই — কিন্তু সৎ ইচ্ছা যাদুপ্রদীপের চেয়েও কার্যকর। সৎ ইচ্ছা নিয়ে এগুতে হবে।

আমরা বিভিন্ন জায়গায় ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করছি — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত এলাকা ঘোষণার ব্যাপারটা কি ভাবা যায় না? সমগ্র দেশের সবচে' নিরাপদ এলাকা হওয়া উচিত ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। আজকাল সন্ধ্যার পর সেই এলাকায় রিকশা যেতে চায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসাবে এই দুঃখ, এই লজ্জা আমি কোথায় রাখি?

আমার কাছে একটি প্রাণের মূল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দশটি শিক্ষাবর্ষের মূল্যের চেয়েও অনেক বেশি। একটি প্রাণ নষ্ট হবার আশংকা যদি থাকে, তাহলে বন্ধ থাকুক বিশ্ববিদ্যালয়। ধরে নিতে হবে, আমরা উচ্চশিক্ষার জন্য তৈরি হইনি। একদিকে বোমা

ফুটবে, গুলি হবে, ছাত্র মরবে, অন্যদিকে আমরা নির্বিকার ভঙ্গিতে ক্লাস করতে থাকব, এ কেমন কথা? আমরা কোথায় চলেছি!

ভূতদের পা থাকে উল্টো দিকে। তারা চলে উল্টো পথে। আমরা ভূত না, আমরা মানুষ। আমরা ভূতের মত উল্টো পায়ে হাঁটতে পারি না। অথচ অনেকদিন ধরেই উল্টোপায়ে হাঁটছি। কেন? কেন? কেন?

সমুদ্র বিলাস

প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনে আমি ছোট্ট একটা ঘর বানাচ্ছি। পৃথিবী নামক এই গ্রহে নিজের জায়গা বলতে এইটুকু। কেন এই কাজটা করলাম? ব্যাপারটা কি তাৎক্ষণিক? হুট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসা?

আমরা সব সময় বলি — "হুট করে কিছু না ভেবে কাজটা করেছি।" ব্যাপারটা মনে হয় সে রকম নয়। মানুষ কখনোই তাৎক্ষণিকভাবে কিছু করে না। তার প্রতিটি 'তাৎক্ষণিক' কাজের পেছনে দীর্ঘ প্রস্তুতি থাকে। এই প্রস্তুতি অবচেতন মনে হয়। সে তার খবর রাখে না।

আজ থেকে কুড়ি বছর আগে আমার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব নড়বড়ে ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হিসাবে সব মিলিয়ে সাতশ'-টাকা বেতন। বিরাট সংসার, ছ'জন ভাইবোন এবং মা। আমার বেতন এবং বাবার সামান্য পেনশন আমাদের সম্বল। এই দুয়ের যোগফল এক হাজার টাকার মত। এই টাকায় এত বড় সংসার টেনে নেয়া সম্ভব নয়। এই অসম্ভব কাজটি করতেন আমার মা।কিভাবে করতেন তিনিই জানেন। মাসের শেষের ক'টি দিন খুব কষ্টে যেত। আমার পকেট শূন্য। মনের আনন্দে আমি যে এক কাপ চা খেয়ে একটা সিগারেট ধরাব সে উপায় নেই। মাঝে মাঝে এমন হয়েছে, ইউনিভার্সিটির ক্লাস শেষ করে শ্যামলীর বাসায় ফিরেছি হেঁটে হেঁটে। রিকশা নেবার সামর্থ নেই। গাদাগাদি ভিড়ে বাসে ওঠাও সম্ভব নয়।

এই অবস্থায় একটা ঘটনা ঘটল। মাসের পঁচিশ তারিখে হঠাৎ করেই সাপ্তাহিক বিচিত্রা আমাকে নগদ তিনশ' টাকা দিয়ে দিল। বিচিত্রা ঈদ সংখ্যায় 'অচিনপুর' নামে একটা উপন্যাস লিখেছিলাম। এই টাকাটা তার সম্মানী। আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড়, কি করব এই টাকাটা দিয়ে?

ইউনিভার্সিটি তখন বন্ধ। ক্লাসে যাবার তাড়া নেই। আমি ঠিক করলাম, ঘুরে বেড়ানো যাক। কোথায় যাব তা ঠিক করা গেল না। টিকিট কেটে চিটাগাং মেইলে উঠে বসলাম। চিটাগাং আগে পৌছানো যাক — তারপর দেখা যাবে। সমুদ্র, পর্বত, অরণ্য অনেক কিছুই দেখার আছে। একটা বেছে নিলেই হবে।

সমুদ্র জয়ী হল। সন্ধ্যাবেলা কক্সবাজার পৌছলাম। ভাল হোটেল বলতে তখন হোটেল সায়েমান। তার ভাড়া সে সময়ে কম হলেও আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। কক্সবাজারে অনেক সরকারী রেস্ট হাউস আছে। কিন্তু সেসব রেস্ট হাউস সরকারি

কর্মকর্তা এবং ভিআইপিদের জন্যে। আমি সরকারি কর্মকর্তা নই, ভিআইপিও নই। সামান্য একজন শিক্ষক।

খুঁজে পেতে সস্তার একটা হোটেল বের করলাম। যার বিছানা নোংরা, বালিশ নোংরা, মেঝে বালিতে কিচকিচ করছে। কমন বাথরুম। অনেকখানি হেঁটে বাথরুমের কাছাকাছি যাবার পর টের পাওয়া যায় — ভেতরে একজন বসে আছে। সেই বাথরুমও বিচিত্র। দরজায় হুড়কো নেই, দড়ি লাগানো আছে। ভেতরে বসে শক্ত করে দড়ি টেনে রাখতে হয়। কারও পায়ের শব্দ পেলে কেশে জানান দিতে হয় — "আছি, আমি আছি।" রাতে মশারি দেয়া হল না। হোটেলের মালিক বললেন, সাগরের হাওয়ায় মশা থাকে না। মশারি লাগবে না। তার কথায় বিশ্বাস করে ঘুমুতে গেলাম। দেখা গেল, মশা শুধু যে আছে তাই না, প্রবলভাবেই আছে। সমুদ্রের স্বাস্থ্যকর হাওয়ার কারণে মশারা সবাই স্বাস্থ্যবতী। স্বাস্থ্যবতীরা ঝাঁক বেঁধে এসে আমাকে কামড়াতে লাগল। স্বাস্থ্যবতী মশা বলার উদ্দেশ্য — স্ত্রী মশারই মানুষের রক্ত খায়, পুরুষরা না। তসলিমা নাসরিন আবার যেন মনে না করে বসেন যে, আমি মহিলা মশাদের ছোট করার জন্যে এই কথা লিখছি। এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য।

সারারাত মশার কামড়ে ঘুম হল না। সূর্য উঠার আগেই আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। গেলাম সমুদ্র দেখতে। প্রভাতের সমুদ্র আমার সব দুঃখ, সব কষ্ট ভুলিয়ে দিল। বিপুল জলরাশির উপর আকাশের ছায়া। সমুদ্রের চাপা কান্না। সমুদ্রের পানিতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তাকিয়ে আছি দিগন্তের দিকে। সীমাবদ্ধ জগতে দাঁড়িয়ে অসীমের উপলব্ধি। আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। আমি স্পষ্ট শুনলাম, সমুদ্র ডেকে ডেকে বলছে — হে মানব সন্তান, আদি প্রাণ শুরু হয়েছিল সমুদ্রে। কাজেই তোমরা আমারই সন্তান। এসো, আমার কাছে এসো। এসো, তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে একটু আদর করে দেই।

আমার মনে হল, ইশ, যদি এমন হত, সুন্দর একটা বাংলো বাড়ি আছে আমার, যে বাড়ির বিশাল টানা বারান্দায় চেয়ার-টেবিল পাতা। আমি ক্রমাগত লিখে যাচ্ছি। যখন ক্লান্ত বোধ করছি তখনি তাকাচ্ছি সমুদ্রের দিকে। তাহলে কী ভালই না হত! আচ্ছা, সরকার কি পারেন না, এমন একটি বাংলো লেখক, কবি-শিল্পীদের জন্যে বানিয়ে দিতে? এঁরা তো সমাজের জন্যেই কাজ করেন — সমাজ কি এঁদের জন্যে কিছু করবে না? সৃষ্টিশীল এইসব মানুষ কি সমাজের কাছে এই সামান্য দাবি করতে পারে না?

ভেবেছিলাম সাত দিন সাত রাত্রি সমুদ্রের কাছে থাকবো। টাকা-পয়সা দ্রুত ফুরিয়ে আসায় তৃতীয় দিনের মাথায় ঢাকায় ফিরে এলাম — মাথায় ঘুরতে লাগল কবি-সাহিত্যিকদের জন্যে বাংলো। অনেকের সঙ্গে আলাপ করলাম। একজন আমাকে

কঠিন ধমক লাগালেন —

'তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। তোমার চিন্তাধারা বুর্জোয়া। লেখক বাংলোতে বসে লিখবেন মানে? তিনি ঘুরবেন পথে পথে। তিনি থাকবেন বস্তিতে, মাঠে, নৌকায়। রাত্রি যাপন করবেন বেশ্যাবাড়িতে। তিনি সংগ্রহ করবেন অভিজ্ঞতা। সমুদ্রপাড়ের বাংলোতে বসে কফি খেতে খেতে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য কঠিন জিনিস। তোমাকে দিয়ে এই জিনিস হবে না।'

আমি ক্ষীণ স্বরে বলার চেষ্টা করলাম — লেখকের একটা কাজ হচ্ছে সৌন্দর্য অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা···

তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, সেই সৌন্দর্য জীবনের সৌন্দর্য, সমুদ্রের নয়।

আমি বললাম, প্রকৃতি কি জীবনের অংশ নয়? লেখকরা সব সময় প্রকৃতির কাছেই প্রশ্নের উত্তরের আশায় ফিরে যান।

'ওরা কোন লেখক না। ওরা ভোগবাদী মানুষ। তুমি তোমার মাথা থেকে সমুদ্র দূর কর। অরণ্য, পর্বত, আকাশ, জোছনা, বৃষ্টি দূর কর। তাহলেই মহৎ সাহিত্য তৈরি করতে পারবে।'

সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্য মাথা থেকে দূর করতে পারলাম না। যতই দিন যাচ্ছে ততই এরা আমার উপর চেপে বসছে। এক ধরনের হাহাকার আমাকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। ঝকমকে বর্ষার রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে যে কথাটা প্রথম মনে হয় তা হল — 'বর্ষার এই সৌন্দর্য দীর্ঘ দিন থাকবে। শুধু এই সৌন্দর্য দেখার জন্যে আমি বেঁচে থাকব না। হায়, জীবন এত ছোট কেন?'

প্রতি বছর সমুদ্র দেখতে যাই। বিরানব্বই সনের শেষ দিকে প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনে গেলাম। দ্বীপের সৌন্দর্য আবার আমার ভেতর পুরানো হাহাকার জাগিয়ে তুলল। আমি মনে মনে বললাম, 'এখানে যদি ছোট্ট একটা ঘর বানানো যেত!'

প্রকৃতি মানুষের কোন বাসনা অপূর্ণ রাখে না। পরম করুণাময় তৎক্ষণাৎ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। ঢাকায় বসেই আমার এই দ্বীপে জায়গা কেনা সম্ভব হল। টেকনাফ এবং সেন্টমার্টিনের লোকজন গভীর আগ্রহে সেখানে বাংলো বানিয়ে দিতে এগিয়ে এলেন। বাংলোর নাম ঠিক করলাম 'সমুদ্র বিলাস।'

সমুদ্রের মুখোমুখি ছোট্ট একটি কাঠের বাংলো, যার ছাদ টিনের। সেই টিন নীল রঙ করা যাতে বাংলোটিকে সমুদ্রের অংশ বলে মনে হয়। পেছনে অনেকখানি খালি জায়গা। খাকি জায়গা রাখার কারণ হল — আমার ইচ্ছা এ দেশের লেখকরা এ সমুদ্র বিলাসে কিছুদিন কাটাবেন, জোছনায় সমুদ্র দেখবেন। ফিরে আসার সময় ঐ খালি

জায়গায় একটা গাছ পুঁতে আসবেন। পাখি উড়ে চলে যাবে। পাখির পালক পড়ে থাকবে। একদিন আমি থাকব না। কিন্তু আমার সমুদ্র বিলাস থাকবে। আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে থাকবে না, থাকবে সৃষ্টিশীল মানুষের জন্যে। তাদের জন্যে এই আমার উপহার।

কুড়ি বছর আগে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, কুড়ি বছর পর তার বাস্তবায়ন হল। এই আনন্দ আমি কোথায় রাখি?

> আমারে তুমি অশেষ করেছ,
> এমনি লীলা তব
> ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
> জীবন নব নব॥

এই দিন তো দিন নয়

প্রাথমিক শিক্ষার উপর আমি কয়েকটা টিভি স্পট তৈরি করে দিয়েছি। ইদানীং এগুলি দেখানো হচ্ছে। আপনাদের চোখে পড়েছে কি? ঐ যে একটিতে লম্বা চুলওয়ালা এক বয়াতীকে দেখা যায়, সে এক দল বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে গান গাইতে গাইতে এগুতে থাকে—

> এই দিন তো দিন নয় আরো দিন আছে
> এই দিনেরে নিবে তোমরা সেই দিনেরো কাছে . . .

এক পর্যায়ে হ্যামিলনের বংশীবাদকের মত সে সবাইকে নিয়ে যায় স্কুলের দিকে। এখন কথা হল, যাদের জন্যে এই জিনিসটা তৈরি করা, তারা কি এটা দেখছে? এর কোন প্রভাব কি পড়ছে? না-কি অর্থ, শ্রম ও মেধাই সবাই মিলে নষ্ট করছি?

স্কুলের সময় চোখ খুলে তাকালে অস্বস্তিকর একটা দৃশ্য দেখা যায়। হাসিখুশি ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে। তাদের ভারী স্কুলব্যাগ যারা টানছে তাদের অনেকের বয়সই স্কুলযাত্রীদের কাছাকাছি। এদের দায়িত্ব আপামণিদের বইয়ের ব্যাগ স্কুলে পৌঁছে দেয়া।

আমাদের অনেকের বাড়িতেই অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা কাজ করে। তাদের কাজ শুরু হয় সূর্য ওঠার আগে, শেষ হয় গভীর রাতে। তাদের কাছে লেখাপড়া অনেক দূরের ব্যাপার। টিভিতে বিজ্ঞাপন প্রচারের আগে লেখাপড়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ওদের শিক্ষিত করার আগে শিক্ষিত করতে হবে তাঁদের, যারা শিক্ষিত হয়েই আছেন। মোটিভেশনাল ছবি এদের জন্যেই আগে করা দরকার।

আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোক খুব তর্ক করলেন — 'সবাই শিক্ষিত হলে দেশ চলবে? একটা এম. এ. পাস ছেলে হাল চালাবে? শিক্ষিত বেকার দিয়ে হবে কি? এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েই বা হবেটা কি? বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের কি শেখাচ্ছে? সন্ত্রাস ছাড়া আর কি?'

এদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। এরা সবকিছুই উল্টো দিক থেকে দেখেন। গোলাপ ফুল এনে দিলে প্রথমে খোঁজেন কাঁটা। তারপর ফুল। ফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে কাঁটা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আমাদের দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা কেন জানি ছায়াটা আগে দেখতে শুরু করেছি।

আমি এক ডাক্তার সাহেবকে চিনি, যিনি তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয়ের একটা বড় অংশ দিয়ে তাঁর নিজ গ্রামে স্কুল এবং কলেজ করে দিলেন। গ্রামে রটে গেল, ডাক্তার সাহেব ইলেকশন করবেন। এসব তারই প্রস্তুতি। কেউ কেউ বললেন, বহু রোগী মেরে

পাপ কামিয়েছে। এখন পাপ কাটানোর চেষ্টা।

মানুষের মুখের এসব কথায় কিছুই আসে যায় না। যা সত্য তা-ই টিকে থাকে। অসত্য স্থায়ী হয় না। সৌভাগ্যক্রমে সত্যকে ভালবাসেন, এমন মানুষের সংখ্যাই এই সমাজে শুধু যে বেশি তাই না, অনেক। এইসব মানুষ সমাজে প্রভাবকের মত কাজ করেন। একজন মন্দ মানুষকে দেখে আমাদের মন্দ হবার ইচ্ছা জাগে না। কিন্তু একজন ভালমানুষকে দেখে ভালমানুষ হতে ইচ্ছা করে।

আমার ছোটবেলায় সিলেটের মীরাবাজারে আমাদের বাসার পাশে একজন ওভারশীয়ার থাকতেন। তিনি রোজ সন্ধ্যাবেলা তাঁর ছেলে-মেয়েদের পড়াতে বসতেন। কাজের ছেলে ছিল, তাকেও পড়তে বসতে হত। এই ছিল কঠিন নিয়ম। পুরনো ছেলেটি চলে যাবার পর নতুন কেউ এলে তার জন্যেও এই ব্যবস্থা। এ বাড়িতে কাজ নিলে পড়াশোনা করতে হবে এই ভয়ে কেউ তাঁর বাসায় কাজ নিত না।

ভদ্রলোকের এই সৎগুণটি আমার মা'কে প্রভাবিত করে। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি, আমার মাও বাসায় এই নিয়ম চালু করেছেন। মা'র বাসায় যেই কাজ করবে তাকেই পড়তে হবে। মা নিজেই পড়ান। আমার মা'র বেলায় সবই পণ্ডশ্রম হয়েছে। তিনি কাউকেই পড়ালেখা শেখাতে পারেননি। জানি না এর কারণ কি।

মা'র ব্যর্থতা পুষিয়ে দিয়েছে আমার মেজো মেয়ে শীলা। তার কাণ্ডকারখানা বেশ মজার। সে তখন পড়ে ক্লাস ফাইভে। প্রায়ই দেখা যায়, সন্ধ্যাবেলা সে কাজের মেয়েদের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আমরা খুবই বিরক্ত হই। দরজা বন্ধ করে সে করে কি? জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে না। মাথা নিচু করে থাকে।

আমার স্ত্রীর ধারণা হল, সে নিশ্চয়ই দরজা বন্ধ করে কাজের মেয়েগুলির সঙ্গে গল্পগুজব করে। এটা ভাল লক্ষণ না। এদের কাছ থেকে সে আজেবাজে গল্প শুনবে। শীলাকে একদিন প্রচণ্ড বকা দেয়া হল। তারপর রহস্য ভেদ হল। হেলেনা নামে আমাদের ১২/১৩ বছর বয়েসী একটি কাজের মেয়ে আছে, তার লেখাপড়া শেখার খুব শখ। সে শীলাকে ধরেছে। শীলা তাকে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছে। অনেকদূর না-কি শিখিয়েও ফেলেছে।

আমি পরীক্ষা নিতে গিয়ে চমৎকৃত হলাম। সত্যি সত্যি হেলেনা মেয়েটি পড়তে শিখেছে। বানান করে করে সুন্দর পড়তে পারে। আমি আমার মেয়েকে বললাম, মা, তুমি যে এই কাজটা করছ — গোপনে করছ কেন?

'তোমরা যদি বকা দাও, এই জন্যে গোপনে করছি।'

আমার এত ভাল লাগল যে বলার নয়।

আমার জীবনে অনেক আনন্দময় ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এত আনন্দময় ঘটেনি। আমি আমার মেয়েকে পুরস্কার দিলাম।

আমার মেয়েটা জানে না সে কত বড় একটা কাজ করেছে। আমি জানি। পড়তে পারার মত আনন্দ আর কিসে আছে? মনের ভাবকে চিরস্থায়ী করে রাখার ক্ষমতা

পরম করুণাময় মানুষকে দিয়েছেন। সে লিখতে পারছে। পশুদের সেই ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

তারপরেও দেখি, মানুষ হয়েও একদল পড়তে পারছে না। লিখতে পারছে না। তারা থেকে যাচ্ছে পশুর স্তরে। ওদেরকে টেনে তুলে আনার দায়িত্বও আমরা অস্বীকার করছি। আমাদের বাংলা ভাষায় খারাপ গালাগালির একটি হচ্ছে 'মূর্খ'। অন্য ভাষায় সে রকম নেই। একজন ইংরেজ অন্য একজনকে **'Ignorant'** বলে গালি দেয় না। এটা প্রমাণ করে — জাতিগতভাবে শিক্ষাকে আমরা কত উঁচুতে স্থান দেই। শিক্ষার প্রতি যে জাতির এত মমতা সেই জাতি কেন সর্বসাধারণকে শিক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে না?

ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এই টাকার একটি অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করলেও কিন্তু ঈপ্সিত ফল পাওয়া যেত। একজন শিক্ষিত মানুষকে বোঝানো অনেক সহজ।

আমার ভাবতে ভাল লাগে, এমন একদিন আসবে যেদিন আমাদের দেশের সব মানুষ লিখতে জানবে, পড়তে জানবে। এটা তেমন কোন কঠিন ব্যাপারও নয়। যদি আইন করে দেয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা উচ্চশিক্ষা নিতে আসবে তারা অতি অবশ্যই দু'জনকে লিখতে এবং পড়তে শিখিয়ে তারপর আসবে।

সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পড়তে আসার জন্যে এটা হবে অবশ্যপালনীয় শর্ত।

অনেক কঠিন কঠিন কথা বলে ফেললাম — একটা গল্প বলে শেষ করি। আমরা তখন বগুড়ায় থাকি। মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছি। হাতে প্রচুর অবসর। দিনরাত গল্পের বই পড়ি। একদিন সতীনাথ ভাদুড়ির 'অচিন রাগিণী' পড়ছি। পড়তে পড়তে চোখে পানি এসে গেল। লজ্জিত হয়ে চোখ মুছছি। তখন দেখি, আমাদের বাসার ঠিকা ঝি অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। সে বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলে — 'এমন কি আছে এখানে যা পড়ে একজন কাঁদতে থাকে? বইয়ের ভেতর কোন দুঃখ ভরে দেয়া হয়েছে?'

আমি তাকে বোঝাতে পারলাম না। সে বইটা হাতে নিয়ে দেখতে চাইল। আমি বইটা তার হাতে দিলাম। সে নেড়ে চেড়ে দেখল। গন্ধ শুঁকল। আমার মাকে গিয়ে বলল, দাদা যখন বই পড়তে পড়তে কান্দে তখন যে কি সুন্দর লাগে!

পাঠকের এই সৌন্দর্য আমরা অবশ্যই সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেব। এই দিন তো দিন নয় আরো দিন আছে। এই দিনেরে নেব আমরা সেই দিনেরো কাছে।

প্রিয় হক ভাই

হক ভাইকে প্রথম দেখি বাংলা একাডেমীতে। তখন তাঁর মাথায় চুল ছিল, হাতে ছিল জ্বলন্ত সিগারেট। তিনি খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে কাকে যেন কী বলছেন। আমি পেছনের দিকে রয়েছি, কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি না। ইন্টারেস্টিং কিছু হবে — এই ভেবে কাছে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে শুনি, হক ভাই বইয়ের ভাষায় কঠিন কঠিন শব্দে জটিল সব বাক্য তৈরী করে রাগ ঝাড়ছেন। আমার মনে হলো, মানুষটা তো বেশ। রাগের সময়ও কথা ঠিক রাখছেন।

তাঁর সঙ্গে পরিচয়ও ভাসা ভাসা পরিচয়। সমস্যাটা আমার — আমি চট করে সহজ হতে পারি না। 'আরে হক ভাই, এতোদিন কোথায় ছিলেন?' বলে গায়ের উপর পড়ে যাওয়া আমার স্বভাবে নেই। সমস্যা কিছুটা হক ভাইয়েরও — কথাবার্তা বলার সময় তিনি দূরত্ব তৈরি করে এমন ভাষা ব্যবহার করেন।

যাই হোক, প্রথম পরিচয়েই আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমি তাঁর রচনার ভক্ত পাঠক। আমার এই কথায় তিনি তেমন উল্লসিত হননি। শুকনো গলায় বললেন, ও আচ্ছা।

এতে আমি খানিকটা আহত হলাম। আমার মনে হলো, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেননি। কাজেই তাঁর প্রচুর লেখা যে আমার পড়া সেই প্রমাণ দেবার চেষ্টা করলাম। এতেও তাঁর তেমন উৎসাহ দেখলাম না। নিজের রচনা সম্পর্কে আলোচনা শুনতে সবাই উৎসাহী হয়, এ মানুষটা হচ্ছেন না কেন? না কি তিনি শুধু আমার প্রতিই এ ধরনের আচরণ করলেন? এই রহস্য এখনো ভেদ হয়নি।

আমি আমার অনেক লেখায় অনেক ইন্টারভ্যুতে বলেছি — সৈয়দ হক আমার প্রিয় লেখক। এ দেশের প্রধান ঔপন্যাসিক আমার মতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নন — সৈয়দ শামসুল হক। নানান কারণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সমালোচকদের সুনজর পেয়েছেন — হক ভাইয়ের ভাগ্যে তা তেমন জোটেনি, বরং অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদ টাইপদের কাছ থেকে পর্ণোগ্রাফিক লেখক আখ্যা পেয়েছেন। এই অসম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল না।

একজন বড়ো লেখকমাত্রই তাঁর লক্ষ্য ঠিক করে নেন। তারপর সেই লক্ষ্যের দিকে খুব সাবধানে এগুতে থাকেন। অনেকটা বিড়ালের নিঃশব্দ যাত্রার মতো। পাঠক বুঝতেও পারেন না লেখক তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। যখন বুঝতে পারেন তখন আর ফিরে

আসার উপায় থাকে না। হক ভাই এই কাজটি অসম্ভব সুন্দর ভঙ্গিতে করেন। একজন বড়ো লেখক চারপাশের জগৎ অগ্রাহ্য করে নিজের কল্পনার জগতে বাস করেন না। বড়ো লেখকের এসকেপিস্ট হওয়ার পথ নেই। হক ভাই এসকেপিস্টদের একজন না, তিনি কখনোই বাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি। তাঁর নিজের আনন্দের জন্য তিনি লেখেন না — পাঠকের আনন্দও তাঁর রচনার প্রধান বিষয় নয় . . .। তাঁর রচনা পাঠ করে মনে হয়, তিনি বিশ্বাস করেন তাঁকে একটি দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এই দায়িত্ব প্রিয় হোক অপ্রিয় হোক তাঁকে পালন করতেই হবে।

একজন বড়ো লেখককে মানুষ হিসেবেও বড়ো হতে হয়। হক ভাই মানুষ হিসেবে বড়ো কিনা আমি জানি না, তেমন ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে মেশার সুযোগ আমার হয়নি, তারপরেও দুটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করছি —

কবি শামসুর রাহমান সাহেব তখন খুব অসুস্থ। বক্ষব্যাধি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ফুসফুসে পানি জমে গেছে। জীবন সঙ্কটাপন্ন। আমি দৈনিক বাংলার সালেহ চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখতে গিয়েছি। কবিকে দেখে মনটা খুব খারাপ হয়েছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, তখন এলেন সৈয়দ শামসুল হক। তিনি কবির কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর একটি হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকের উপর রাখলেন এবং বললেন, আমি সবার সামনে এই প্রার্থনা করছি — আমার আয়ুর বিনিময়ে হলেও আপনি যেন বেঁচে থাকেন।

বলেই তিনি আর দাঁড়ালেন না, ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। আমি দেখলাম, সৈয়দ হক কাঁদছেন। আজ শুনতে পাই দুজনের সম্পর্কের খুব অবনতি হয়েছে। একে অন্যের নাম পর্যন্ত শুনতে পারেন না। তারপরেও আমি নিশ্চিত জানি, আবারো যদি কবি অসুস্থ হন — সৈয়দ হক ছুটে যাবেন এবং কবির রোগমুক্তি প্রার্থনা করবেন।

এবার দ্বিতীয় ঘটনাটা বলি — আমি তখন শহীদুল্লাহ্ হলে থাকি। হঠাৎ খুব শরীর খারাপ হলো। নিঃশ্বাস নিতে পারি না। ভয়াবহ শারীরিক কষ্ট। হক ভাই কার কাছ থেকে আমার অসুখের খবর শুনলেন। শোনামাত্র ছুটে এলেন আমার বাসায়। বিছানায় আমার পাশে বসে কঠিন গলায় বললেন — হুমায়ূন, তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে এবং অনেক দিন বেঁচে থাকতে হবে। তোমার হাতে ছয়টি আঙুল। এই ছ'টি আঙুলের একটি হলো কলম। ছ'আঙুলি মানুষের অসুস্থ হওয়া চলে না।

হক ভাইয়ের সুন্দর করে বলা এই বাক্য দুটি আমার অনেক সঞ্চয়ের একটি। মাঝে মাঝে সমালোচকদের কঠিন আক্রমণে যখন দিশেহারা হয়ে যাই তখন নিজের ডান হাত চোখের সামনে মেলে ধরে বলি — আমার হাতে ছ'টি আঙুল। ছ'-আঙুলি মানুষদের দিশেহারা হলে চলে না।

ভোরের কাগজ হক ভাইয়ের ওপর একটি বিশেষ সংখ্যা বের করছে শুনে খুব ভালো লাগছে এই কারণে যে, আমি তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানোর একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম।

হক ভাই, আপনি ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন — আপনার প্রতি এই আমার শুভ কামনা। আপনি অতি ভাগ্যবান। জীবন তার মঙ্গলময় হাতে আপনাকে স্পর্শ করেছে— এই বিরল সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

ফুটবল ও আমরা

চার বছর আগে কথা। অয়োময় ধারাবাহিক নাটকের চিত্রায়ন হচ্ছে ময়মনসিংহের রাজবাড়িতে। ক্যামেরা নিয়ে সবাই বসে আছি। শিল্পীরা তৈরি। পরিচালক নওয়াজিশ আলী খান 'এ্যাকশান' বললেই অভিনয় পর্ব শুরু হবে। এমন সময় ঝামেলা শুরু হল। মিছিলের প্রচণ্ড শ্লোগানে চারদিক কাঁপতে লাগল। আমাদের দেশটা মিটিং-মিছিলের দেশ। শ্লোগান কোন নতুন ব্যাপার না। কিন্তু সেদিনের মিছিলের শ্লোগান অতি বিচিত্র। সাধু ভাষায় বলা যেতে পারে 'অশ্রুতপূর্ব।' শ্লোগান হচ্ছিল — 'ওয়ার্ল্ড কাপ সিদ্ধান্ত ! মানি না। মানি না। আর্জেন্টিনাকে চ্যাম্পিয়ন ! করতে হবে, করতে হবে।'

নওয়াজিশ আলী খান বিস্মিত হয়ে বললেন, ব্যাপার কি ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তাঁকে বললাম — লোকজন আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন না হওয়ায় ক্ষেপে গেছে। এই জন্যেই মিছিল, শ্লোগান, আন্দোলন।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, আন্দোলন করে লাভ কি? আমি বললাম, আমরা ময়মনসিংহের লোক, আমরা লাভ-লোকসান বিচার করে আন্দোলন করি না। আমাদের ফেবারিট টিম আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা হেরে যাবে আর আন্দোলন করব না, তা হয় না।

নাটকের ইউনিটের সবাই কৌতূহলী হয়ে মিছিল দেখতে গেল। বিশাল জঙ্গী মিছিল। গলায় রুমাল বাঁধা এক যুবক আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করছে — আর্জেন্টিনাকে চ্যাম্পিয়ন না বানালে —

বাকি সবাই ধুয়া ধরছে, — জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে।

নওয়াজিশ আলী খান বিনীত ভঙ্গিতে জানালেন যে, তিনি এই জীবনে অনেক পাগল দেখেছেন। ময়মনসিংহের লোকের মত পাগল দেখেননি।

এই ঘটনা আমি জাতিগতভাবে বাঙালীর ফুটবল প্রীতির নমুনা হিসাবে উপস্থিত করলাম। সাম্প্রতিক আরেকটি নমুনা দিচ্ছি। ডামফা কাপ ফাইনাল কিছুদিন আগে হয়ে গেল। আবাহনীর হয়ে খেলছেন ইরাকী খেলোয়াড় নজর আলী। তিনি গোল করলেন । টিভিতে এই দৃশ্য দেখে এক দর্শক 'নজর আলী' বলে বিকট চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারালেন। দ্বিতীয় দিনও তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। এই খবর পত্রিকার মারফতে আমি জানি। ও আচ্ছা, আরেকটি ঘটনা মনে পড়েছে। গত ওয়ার্ল্ড কাপের সময় আমার এক দূর সম্পর্কের ফুপুকে বিশেষ বিশেষ খেলার দিনে রোজা রাখতে হয়েছে। ভদ্রমহিলার বয়স ষাটের কাছাকাছি। ফুটবল খেলা নিয়ে তাঁর কোন রকম মাথাব্যথা নেই। থাকার কথাও নয়। তারপরেও তাঁকে রোজা রাখতে হয়েছে। কারণ তাঁর ছেলের ফেবারিট টিমের খেলা। ছেলে নিজে রোজা রাখতে পারে না, কষ্ট হয়। মাকে দিয়ে রাখাচ্ছে।

আমাদের জাতীয় খেলা কাবাডি নয় — ফুটবল। মজার ব্যাপার হল এই ফুটবল আমরা কিন্তু খেলতে পারি না। গত সাফ গেমসে আমাদের ফুটবলাররা শরীর ফিট রাখার জন্যে এক মণ মধু খেয়ে কি খেলা খেলেছিলেন, তা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। আমাদের খেলোয়াড়রা বিদেশে খেলতে গিয়ে দশ–বারোটা করে গোল হাসিমুখে খান। আমরা দল বেঁধে এয়ারপোর্টে তাঁদের আনতে যাই। তাঁরা সেখানে গম্ভীরমুখে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। গলাটলা কাঁপিয়ে ভাষণ দেন।

'আমাদের টিম অত্যন্ত ভাল খেলেছে। পাসের আদান–প্রদান এবং দলীয় সমঝোতা ছিল অসাধারণ পর্যায়ের। আমরা প্রতিপক্ষকে বেশিরভাগ সময়ই কোণঠাসা করে রেখেছিলাম। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তারা ছিল প্রবল চাপের মুখে। আমরা যে পরাজিত হয়েছি তা নিতান্তই ব্যাড লাক। আমরা আসলে ভাল খেলে পরাজিত। তবে এই পরাজয় বৃথা যায়নি। পরাজয় থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করেছি। সে শিক্ষা ভবিষ্যতে বিদেশের মাটিতে জয়লাভ করতে আমাদের সাহায্য করবে।'

পরাজয়ের শিক্ষা মনে হয় তেমন কাজে আসে না। কাজে এলে অসংখ্য পরাজয় থেকে এরইমধ্যে আমরা অনেক কিছু শিখে ফেলতাম। কিছু শিখতে পারিনি। পারব এমন লক্ষণও দেখছি না।

তারপরেও আমরা ফুটবল ভালবাসি। বাঙালী বাবারা তাদের পুত্রদের প্রথম যে খেলনা কিনে দেন তার নাম ফুটবল। কেন?

আজ পত্রিকায় দেখলাম — পলিটেকনিকের ছেলেরা ওয়ার্ল্ড কাপের সময় পরীক্ষা পড়েছে এই রাগে তাদের কলেজের চেয়ার–টেবিল, দরজা–জানালা সব ভেঙে একাকার করেছে। ভালবাসা নামক এই অবসেসানের কারণ কি?

মনস্তত্ত্ববিদরা কারণ হয়ত জানেন। আমার নিজের ধারণা আমরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ঘন্টাখানিকের জন্যে উত্তেজিত হতে ভালবাসি। উপদেশ এবং গালি দিতে পারলে আমাদের খুব আনন্দ হয়। খেলার মাঠে যত ইচ্ছা উপদেশ এবং দেয়া যায়। নমুনা —

'কানা তুই দেখস কি? পাস দে। তোর বাপের বল, 'পায়ের চিপায়' রেখে দিয়েছিস?'

(শব্দটা পায়ের চিপা নয়, অন্য এক স্থান। শালীনতার কারণে পায়র চিপা বললাম। বুদ্ধিমান পাঠক বুঝে নিন)।

'ল্যাং মার। ল্যাং মার। আরে কুত্তার বাচ্চা, ল্যাং মেরে ফেলে দে না।'

'ভ্যাবদা মেরে বসে আছিস ক্যান রে চান্দি ছোলা? শট দে। শট দেয়া ভুলে গেছিস?'

(এই খেলোয়াড়ের মাথায় চুল কম বলেই আদর করে চান্দি ছোলা বলা হচ্ছে)।

'ঐ শুওরের বাচ্চার চোখ তুলে ফেল।'

'চামড়া ছিলে লবণ মাখিয়ে দে'

'টান মেরে — ছিঁড়ে ফেল।'

(কি ছিঁড়তে বলা হয়েছে পাঠক বুঝে নিন)।

খেলা শেষ হবার পরপর রেফারিকে ধোলাই দেয়ার একটা ব্যাপার চলে আসে। নূতন কোন ব্যাপার না। আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে। বাঙালী রেফারিরা এতে কিছু মনেও করে না। ধোলাই খাওয়াটাকে তারা কপালের লিখন হিসাবে মেনে নিয়েছে। অবশ্যি রেফারিকে ধোলাই দেয়ার এই প্রবণতা শুধুমাত্র বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য নয়, এটা সর্বজনীন। পাঞ্চ পত্রিকায় একটা কার্টুন দেখেছিলাম। কার্টুনে তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে একটা বেড সাজানো হচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হয় ব্যাপার কি? হাসপাতালের এটেনডেন্ট বলল, আজ ফুটবল খেলা আছে না? এই বেড রেফারির জন্যে।

যাই হোক, চার বছর পর আবার আসছে ওয়ার্ল্ড কাপ। এই সময়ের সবচে' বড় ঘটনা এবং আশ্চর্যজনক ঘটনা।

বাতাস ভর্তি চামড়ার একটি গোলকের দিকে সারা পৃথিবীর মানুষ তীব্র উত্তেজনা নিয়ে তাকিয়ে থাকবে — এর চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আর কি হতে পারে? আমরা বাঙালীরা খেলা দেখতে দেখতে কিছু সময়ের জন্যে হলেও আমাদের শৈশবে ফিরে যাব। তার মূল্যও বা কম কি? ঝুম বৃষ্টি পড়ছে। আমরা ভিজে ন্যাতা ন্যাতা। বৃষ্টিভেজা মাঠে জাম্বুরা নিয়ে আমরা দৌড়াচ্ছি। পায়ের নিচে পানি ছপ ছপ করছে। কে যেন গড়িয়ে পড়ল কাদায়। পড়ুক। দেখার সময় নেই। বল নিয়ে দৌড়াতে হবে। ঐ তো দেখা যায় গোল পোস্ট।*

* ফুটবল নিয়ে এই সংকলনে আরেকটি লেখা আছে। লেখাটার শিরোনাম 'খেলা'। দু'টি লেখার মূল বিষয় একই। একটা লেখা রাখলেই চলত, তবু দু'টাই রেখে দিলাম।

অন্য রকম উৎসব

ছোটবেলায় আমি একবার 'মেহমানী' উৎসবে গিয়েছিলাম।

আজকালকার পাঠক-পাঠিকারা 'মেহমানী' শব্দটার সঙ্গে পরিচিত কি না জানি না, কাজেই একটু ব্যাখ্যা করে নেই। আগেকার আমলে বিত্তবান লোকদের একটা প্রবণতা ছিল তাদের বিত্তের বিষয় অন্যদের জানানো। মেহমানী উৎসবের শুরুটা বোধহয় সেই 'বিত্ত প্রদর্শনীতে'। এই উৎসবে কোন একটা উপলক্ষ ধরে তিন গ্রাম, পাঁচ গ্রাম কিংবা সাত গ্রামের মানুষকে দাওয়াত করা হত। সে এক হুলুস্থুল ব্যাপার।

শৈশবের স্মৃতি থেকে বলি, আমার নানার বাড়ির কাছেই চন্দ্রপুর গ্রাম। সেই গ্রামের বিত্তবান একজন মানুষ তাঁর বাবার মৃত্যুদিনে মেহমানী দেবেন। তিন গ্রামের মানুষকে দাওয়াত করা হয়েছে। দশটি গরু উৎসব উপলক্ষে প্রাণ দিয়েছে, আরো পাঁচটি অপেক্ষা করছে। প্রয়োজনে এদেরও প্রাণ দিতে হবে।

খাবার আয়োজন খোলা মাঠে। অগুণতি মানুষ। সমুদ্র গর্জনের মত শব্দ উঠছে। স্রোতের মত মানুষ আসছে — খাচ্ছে — চলে যাচ্ছে। রান্নার বিরাম নেই, খাওয়ারও বিরাম নেই। আমার বিশেষ কিছু মনে নেই। শুধু মনে আছে — খোলা মাঠে আট-দশটা নৌকা সারি বেঁধে রাখা। নৌকাভর্তি ডাল। ডালের পাত্র হিসেবেও যে নৌকার একটা ব্যবহার আছে, আমার জানা ছিল না।

আমাদের খেতে বসতে বসতে রাত বারোটার মত বেজে গেল। মানুষের তুলনায় আলো কম। চাঁদের আলোয় মাটিতে সানকি নিয়ে মিছিলের একজন হয়ে বসেছি। সানকি উঁচু করে একজন ভাত দিয়ে গেল। সেই ভাতের উপর একজন এসে ঢেলে দিল এক গাদা গোশত। মুখে দিয়েছি কি দেইনি এর মধ্যে ডাল চলে এল। যিনি মেহমানী দিচ্ছেন (সম্পর্কে তিনি আমার মা'র আপন খালু) তিনি এক পর্যায়ে হাত জোড় করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন — এবং বললেন, তাঁর দাওয়াত রক্ষা করার জন্যে তিনি যে কী পরিমাণ আনন্দিত সেটিও অনেক অলংকার-দেয়া ভাষায় জানানো হল এবং তিনি বারবার বলতে লাগলেন, তিনি অতি অভাজন। নাদান। অতি নগণ্য। বলতে বলতে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি কাঁধে ফেলে রাখা চাদরে চোখ মুছতে লাগলেন।

যাঁরা মেহমানী দেন তাঁদের এই সব বলতে হয়। এটাই নিয়ম। তিনি নিয়ম রক্ষা করছেন। আবেগে অশ্রুবর্ষণও নিয়ম রক্ষারই অংশ।

শৈশবের 'মেহমানী'র স্মৃতি আমার মধ্যে বেশ ভালভাবেই ছিল। আমার মেয়েদের কাছে আমি এই গল্প বেশ ক'বার করেছি। এরা প্রতিবারই বলেছে, বাবার কী যে আজগুবি সব গল্প — নৌকাভর্তি ডাল ! নৌকার বৈঠা ডাল নাড়ার চামচ।

আমি সুযোগ খুঁজছিলাম আমার মেয়েদের এই দৃশ্য দেখানো যায় কি-না। কোনই সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। মেহমানী দেয়ার রীতি হয়ত দেশ থেকে উঠে গেছে। এই অবস্থায় আমি নিজেই একটা মেহমানী দেব বলে ঠিক করলাম। মা'কে বললাম — আমি আমার বাচ্চাদের গ্রামের মেহমানী দেখাতে চাই। আমি আমার গ্রামের সব মানুষকে একবেলা খাওয়াব। এরা সবাই একবেলা খাবে, এবং সারারাত জেগে গান শুনবে। আপনি ব্যবস্থা করুন। মা ব্যবস্থা করলেন। সেই মচ্ছব দেখার জন্যে আমি ঢাকা থেকে বন্ধুবান্ধবের পঞ্চাশজনের এক দল নিয়ে রওনা হলাম।

ঢাকার বন্ধুরা কাণ্ডকারখানা দেখে চমৎকৃত হলেন। কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম, তা কিন্তু হল না। আমার শৈশবস্মৃতির সঙ্গে মিলাতে পারলাম না। নৌকাভর্তি ডাল নেই। ভাতের পাহাড় নেই। মাটির সানকি নেই। অবশ্যি আমাদের আয়োজনও অল্প। আমাদের গ্রাম ছোট। মাত্র সাতশ লোকের বাস। তবে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে চার হাজার মানুষের — হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার না। এলোমেলো ভাবও নেই। তবুও হাজার হাজার মানুষ খাচ্ছে। দেখার মতই উৎসব। কিন্তু এই উৎসব আমার তিন কন্যাকে স্পর্শ করল না। বড় মেয়ে বলল, "লোকজন এসে খেয়ে যাচ্ছে — এতে দেখার কি আছে বাবা? মানুষের খাওয়া দেখতে আমার ভাল লাগে না।" ছোট মেয়ে বলল, "তুমি বলেছিলে নৌকাভর্তি ডাল থাকবে। নৌকা কোথায়?"

আমার তিন কন্যা গাছে উঠে বসে রইল। ওদের নাকি গাছে বসে থাকতেই বেশি ভাল লাগছে।

খাওয়া চলল সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যাবেলায় খেতে বসল আশেপাশের গ্রামের ফকির-মিসকিনরা। শহরের ফকির এবং গ্রামের ফকিরদের ভেতর একটা প্রভেদ লক্ষ্য করলাম। শহরের ফকিররা তাদের দৈন্যদশা প্রদর্শনে অসম্ভব আগ্রহী। গ্রামের এরা এই ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতে চায়। আজ তারা সবাই তাদের সবচেয়ে ভাল পোশাকটা পরে এসেছে। ভদ্র, বিনয়ী আমন্ত্রিত অতিথির মত আসন গ্রহণ করছে।

এদের খেতে দেয়া হল। আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল যাতে আমি 'মেহমানী'র বক্তৃতাটা দেই। আমি যথারীতি উপস্থিত হলাম এবং বললাম,

"আমি নিতান্তই অভাজন। আমার নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে আপনারা যে কষ্ট করে এসেছেন এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।"

খাওয়া শুরু হল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। কি আগ্রহ নিয়েই না এরা খাচ্ছে ! প্লেট ভর্তি করে মাংস দিয়ে গেল। এরা মুগ্ধ চোখে মাংসের স্তূপের দিকে তাকাচ্ছে। এক মহিলা আনন্দিত গলায় বললেন, "আফনেরা কি খাওয়াইতে খাওয়াইতে আমরারে মাইরা ফেলাইবেন?" (আপনারা কি খাওয়াতে খাওয়াতে আমাদের মেরে ফেলার মতলব করেছেন?)

এই মহিলার আনন্দিত গলা শুনে হঠাৎ আমার চোখে পানি এসে পড়ল। হঠাৎ মনে হল, আমি আমার শৈশবের স্মৃতি নতুন করে তৈরি করতে পারিনি। না পারলেও

আমার শ্রম, আমার অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে। অন্তত কিছু সময়ের জন্যে হলেও এইসব হতভাগ্যদের আনন্দিত চোখ আমি দেখলাম। এ আমার পরম সৌভাগ্য।

চল্লিশ বছর আগে আমার মা'র খালু এমনই এক মেহমানী উৎসবে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। অতিথিদের খেতে বলার পর তিনি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করেছিলেন। সেদিন মনে হয়েছিল, তিনি মেকি কান্না কাঁদছেন। চল্লিশ বছর পর চোখের জল ফেলতে ফেলতে বুঝলাম, তাঁর সেদিনের কান্না মেকি ছিল না। আমি তাঁর আত্মার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

আমার মনে হল — যদি আমার ক্ষমতা থাকতো, আমি অবশ্যই এদেশের প্রতিটি নিরন্ন মানুষকে খাওয়াতাম। আমি জানি, আমার এই আবেগ সাময়িক — আমি শহরে ফিরে যাব, আমার আর কিছুই মনে থাকবে না। তবুও ক্ষণিকের জন্যে হলেও এক মহান বোধ আমার ভেতর সৃষ্টি হয়েছিল — তার মূল্যই বা কম কি? যে মঙ্গলময় আমার ভেতর এই বোধ তৈরি করেছিলেন — তিনি সেই বোধ সবার ভেতর ছড়িয়ে দিবেন — এই আমার প্রার্থনা।

কচ্ছপের গল্প

ঔপন্যাসিক আসিফ নজরুল সেদিন আমার বাসায় এসেছে। গম্ভীর চেহারার একজন ছেলে। নিজের ওপর তার আস্থা সীমাহীন। কাটা কাটা কথা বলে আশপাশের মানুষদের চমকে দেয়ার সূক্ষ্ম চেষ্টা আছে। মানুষকে চমকে দিয়ে কথাশিল্পী মাত্রই আনন্দ পান। আসিফ তার ব্যতিক্রম হবে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। ব্যতিক্রম কিছুটা আছে। তার কথায় অন্যকে আহত করার চেষ্টা আছে।

যাই হোক, তাকে আমি আনন্দিত স্বরে বললাম, কি খবর?

সে আমার আনন্দিত স্বরকে তেমন পাত্তা দিল না। কঠিন গলায় আমার স্ত্রীকে বলল, আচ্ছা ভাবী, হুমায়ূন ভাই কি হিপোক্রেট?

গুলতেকিন হকচকিয়ে গিয়ে বলল, কই না তো! ও যা বিশ্বাস করে তাই তো বলে। ভান তেমন করে না তো!

'ভাবী, উনার ওপর একটি বই বের হয়েছে 'ঘরে বাইরে হুমায়ূন আহমেদ' — আপনি কি সেটি পড়েছেন? যদি পড়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার চোখে পড়েছে — প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করলেন — বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সম্পর্কে কিছু লেখা হয়নি — আপনি নিজে কেন লিখছেন না?'

'হ্যাঁ, চোখে পড়েছে।'

'তার উত্তরে হুমায়ূন ভাই যা বললেন তার ভেতরে হিপোক্রেসি কি আপনি ধরতে পারেননি?'

'না তো।'

'আপনার ধরতে পারার কথা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস সম্পর্কে কোন উপন্যাস লেখা হয়নি এটা হুমায়ূন ভাই স্বীকার করে নিয়েছেন — কিন্তু তিনি জানেন আমার একটি উপন্যাস এই প্রসঙ্গে আছে — 'নিষিদ্ধ কয়েকজন'। তিনি বইটি পড়েছেন, তিনি আমাকে বলেছেন বইটি তাঁর ভাল লেগেছে। অথচ ইন্টারভ্যু দেয়ার সময় এই ব্যাপারটা তিনি উল্লেখ করেননি। এটা এক ধরনের হিপোক্রেসি নয়?'

গুলতেকিন বলল, ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেলে অবশ্যই হিপোক্রেসি।

ব্যাপারটা যে হিপোক্রেসি নয় আমি তা বোঝানোর চেষ্টা করলাম। বললাম — প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় কখনো খুব ভেবেচিন্তে উত্তর দেয়া হয় না। যা মনে আসে তাই বলা হয়। নিজেকে 'ডিফেণ্ড' করার একটা চেষ্টা থাকে। অন্য কারোর কথা মনে থাকে না। তোমার 'নিষিদ্ধ কয়েকজনের' কথা সেই কারণেই উল্লেখ করা হয়নি। তবে তোমার ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, আমি আমার একটি বই তোমাকে উৎসর্গ করেছি।

আসিফ আরো কিছু কঠিন কথা বলার জন্যে নিজেকে তৈরি করল — তার চোখ তীক্ষ্ণ হল এবং ভুরু খানিকটা কুঁচকে গেল। আমি তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললাম —

'তুমি লেখালেখি শুরু করেছ মাত্র দু'তিন বছর হলো। এর মধ্যেই আমি তোমাকে একটি বই উৎসর্গ করেছি। আর আমার অবস্থাটা দেখ, আমি কুড়ি বছর ধরে লেখালেখি করার পর আমাকে বই উৎসর্গ করলেন কবি শামসুর রাহমান এবং সৈয়দ শামসুল হক। তাঁরা যে আমার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে এই কাজটি করলেন তাও কিন্তু না। আমি তাঁদের বই উৎসর্গ করেছিলাম, তাঁরা ভদ্রতা করেছেন, 'উৎসর্গ' ফেরত দিয়েছেন। তুমি আমাকে বই উৎসর্গ করবে, তার উত্তরে আমি করব তা কিন্তু হয়নি — আমি তোমার বই উৎসর্গের জন্যে অপেক্ষা করিনি —

আসিফ বলল, আমাকে কিছু কথা বলার সুযোগ দিন।

'না, তোমাকে সুযোগ দেয়া হবে না। তুমি আমার কথা শোন। আমি দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলাম। দেশে কি লেখালেখি হচ্ছে সেই সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। দেশে এসে শুনলাম ইমদাদুল হক মিলন নামে একজন খুব লেখালেখি করছেন। মেলাতে আমি তাঁর বই কিনলাম। একটি বই 'পরাধীনতা' পড়ে আমার এত ভাল লাগল যে আমি সেই 'পরাধীনতা' নিয়ে দীর্ঘ একটা প্রবন্ধ লিখলাম দৈনিক বাংলায়। তখনো এই লেখকের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় হয়নি। কাজেই তুমি বলতে পার না আমার ভেতর কোন হিপোক্রেসি আছে।'

'দু'টি উদাহরণ দিয়েই আপনি আপনার দায়িত্ব শেষ করেছেন। সেটা কি ঠিক হচ্ছে? আপনি কি এই প্রজন্মের লেখকদের সম্পর্কে আপনার দায়িত্ব পালন করেন? নিয়মিত তাঁদের লেখা পড়েন? তাঁদের উৎসাহ দেন? তাঁদের বিকশিত হতে সাহায্য করেন?'

আমাকে স্বীকার করতে হল, আমি তা করি না। আমি তাকে হাসতে হাসতে বললাম, দায়িত্বে অবহেলার এই ব্যাপারটা আমি শিখেছি আমার অগ্রজদের কাছ থেকে। শওকত ওসমান স্যারের কথাই ধরা যাক। আমার শিক্ষক। ঢাকা কলেজে আমাদের বাংলা পড়াতেন। তাঁর চোখের ওপর আমি লেখালেখি শুরু করেছি। তাঁর সঙ্গে যখন দেখা হয়, তিনি আমার লেখালেখি সম্পর্কে অনেক ভাল কথা বলেন, কিন্তু কথা হচ্ছে, এই কুড়ি বছরে তিনি সাহিত্য-বিষয়ক অনেক কিছুই লিখেছেন কিন্তু কোথাও 'হুমায়ূন আহমেদ' এই নামটি নেই।

প্রসঙ্গক্রমে কবি শামসুর রাহমান সাহেবের কথা বলি। অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদের বাড়িতে আমি, কবি শামসুর রাহমান, দৈনিক বাংলার সালেহ চৌধুরী এবং হুমায়ূন আজাদ আড্ডা দিচ্ছি। আমি এক পর্যায়ে কবিকে বললাম, নির্মলেন্দু গুণকে কবি হিসেবে আপনার কোন্ স্তরের মনে হয়? কবি শামসুর রাহমান আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন — শুধু আপনাকেই বলছি — বাইরে 'কোট' করবেন না —

নির্মলেন্দু গুণকে আমার খুব বড় মাপের কবি বলে মনে হয়। আমি হতভম্ব হয়ে আমার দেশের প্রধান কবির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি যদি কাউকে বড় কবি মনে করেন তাহলে তা প্রকাশ করতে অসুবিধা কি? কেন এটা তাঁকে ফিসফিস করে বলতে হবে? তিনি হয়ত ভেবেছেন, তাঁর বক্তব্যে অন্য কবিরা তাঁর ওপর ক্ষেপে যাবেন। খুব ভুল ভাবেন নি। চারদিকের আবহাওয়া বিচার করে তাঁর মত কবি মত প্রকাশ করবেন? কবিরা দেশের আত্মা, তারপরেও এত দ্বিধা?

কাকের মাংস কাকে খায় না, লেখকের মাংস লেখক খায়। বেশ মজা করেই খায়। ঈর্ষা নামক ব্যাপারটা বোধহয় সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে যুক্ত। এই ঈর্ষার জন্যেই হয়ত আমরা একজন অন্যজনকে অস্বীকার করি।

হাসন উৎসবে সুনামগঞ্জ গিয়েছিলাম। প্রথম দিন হাসন রাজার গান হল। পরের দিন কবিদের অনুষ্ঠান। যেসব কবি আসবেন নিমন্ত্রণপত্রে তাঁদের নাম ছাপা হয়েছে। একজন কবি সেই অনুষ্ঠানে এলেন না, কারণ তাঁর নামের আগে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার নাম ছাপা হয়েছে। তিনি কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার সিনিয়র, তাঁর নাম আগে যাওয়া উচিত ছিল। হায় রে সিনিয়রিটি! মহাকাল সিনিয়রিটি দেখে না। সে তার কঠিন পাল্লায় সবকিছু মাপে। সেই মাপে ভুল হয় না।

আমরাই শুধু তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাতামাতি করি। কচ্ছপের খোলসের ভেতর নিজেকে নিয়েই শুধু বাস করতে চাই। এই খোলস ছেড়ে আমাদের বেরুবার উপায় নেই, কারণ খোলসবিহীন কচ্ছপ পৃথিবীতে দেখা যায় না।

আমি নিজেও একটা শক্ত খোলসে নিজেকে আটকে ফেলেছি। নতুন প্রজন্মের শক্তিমান লেখকরা খোলসমুক্ত হবেন — এই আমার শুভ কামনা। আমার অগ্রজরা এবং আমরা যে ভুল করেছি তাঁরা তা করবেন না। বাংলা সাহিত্যকে অনেক দূর এগিয়ে নেবার দায়িত্ব তাঁদের। যে মশাল আমরা তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারিনি, সেই মশাল তাঁরা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছুটতে শুরু করবেন। শুধু মনে রাখবেন — তাঁদের কচ্ছপ হওয়া চলবে না। কচ্ছপরা ছুটতে পারে না।

ছেলেটা

আমি এলিফেন্ট রোডের যে এ্যাপার্টমেন্ট হাউসে থাকি তার নিয়ম-কানুন খুব কড়া। যে-কেউ ইচ্ছা করলেই ঢুকতে পারে না। গেটেই তাকে আটকানো হয়। রিসিপশনিস্ট (মহিলা নয়, পুরুষ) কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করেন — কোথায় যাবেন? কার কাছে যাবেন? কোত্থেকে এসেছেন? এখানেই শেষ না। যার কাছে যাওয়া হবে তাকে ইন্টারকমে ধরা হয়। তাঁকে বলা হয় — অমুক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। পাঠাব? যদি পাঠানোর অনুমতি পাওয়া যায় তবেই দর্শনার্থী ঢুকতে পারেন।

ব্যবস্থা ভাল। উটকো লোকের ঝামেলা থাকে না।

আমি আবার এই ভাল ব্যবস্থার উপর এককাঠি। আমার দিক থেকে রিসিপশনিস্টকে নির্দেশ দেয়া আছে সকাল দশটার আগে কাউকেই যেত আসতে না দেয়া হয়। আমি রাত জেগে লেখালেখি করি,পড়াশোনা করি। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়। হাত-মুখ ধুতে ধুতে দশটা বেজে যায়। বাসি মুখে কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না।

রিসিপশনিস্ট আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। একদিন তার ব্যতিক্রম হল। ভোর ছ'টায় ইন্টারকম বেজে উঠল। একজন ছেলে এসেছে। খুব কাঁদছে। একটা জরুরী চিঠি সে নিয়ে এসেছে। নিজেই আমার হাতে দেবে। এক্ষুণি দিতে হবে।

আমি তাকে উপরে পাঠাতে বললাম। চেহারা দেখে মনে হল কলেজে পড়ে। ভদ্র চেহারা। মাথা নিচু করে আছে। হাতে রুমাল। মাঝে মাঝে রুমালে চোখ মুছছে। আমি বললাম, কি ব্যাপার? সে একটা কাগজ বের করে দিল। একটা চিঠি। আমাকে সম্ভাষণ করে লেখা। চিঠির ভাষা হুবহু মনে নেই মোটামুটিভাবে এরকম —

> হুমায়ূন সাহেব,
>
> আপনার মেয়ে শীলা আমার ছাত্রী। আমি খুব বিপদে পড়ে আমার ছেলেকে আপনার কাছে পাঠালাম। আমার স্বামী গতকাল রাত তিনটায় মারা গেছেন। আমার হাত একেবারে খালি। মৃতদেহের সৎকারের জন্যে এই মুহূর্তে কিছু টাকা দরকার। আপনি কি ঋণ হিসেবে আমার ছেলের হাতে দু'হাজার টাকা পাঠাবেন? ছাত্রীর বাবার কাছে টাকার জন্যে হাত পাততে হল — এই লজ্জা আমার রাখার জায়গা নেই। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক। ইতি

আমি আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম — মা, '. . . ' এই নামে তোমার কোন টিচার আছেন?

শীলা বলল, হ্যাঁ, উনি আমাদের ক্লাস টিচার। খুব ভাল টিচার।

আমি আর সময় নষ্ট করলাম না। ছেলেটির হাতে দু'হাজার টাকা দিলাম। তাকে

সান্ত্বনা দিয়ে কিছু কথা বললাম। যদিও জানি, প্রবল শোকের সময়ে সান্ত্বনার কথা খুব হাস্যকর শোনায়। ছেলেটি চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। আমার খানিকটা মন খারাপ হল এই ভেবে যে, মৃত্যুর প্রবল শোকের যন্ত্রণা ছাপিয়ে অর্থকষ্টের যন্ত্রণা এই সমাজে বড় হয়ে উঠছে।

হাত-মুখ ধুয়ে নাশতার টেবিলে বসেই মনে হল — একটা ভুল হয়েছে। ছেলেটি মিথ্যা কথা বলে টাকা নিয়েছে। চিঠির বক্তব্য অনুসারে ছেলেটির বাবা মারা গেছেন রাত তিনটায় — তার মাত্র তিন ঘণ্টা পর সে টাকার সন্ধানে বের হয়েছে। এটা তো হতে পারে না। মৃত্যুর প্রাথমিক ধাক্কা সহ্য করতেও অনেক সময় লাগবে। টাকার কথা মনে হবে প্রাথমিক ধাক্কা কেটে যাবার পর।

আমার মন বেশ খারাপ হল। দু'হাজার টাকা এমন কোন অর্থ না যার জন্যে মন এতটা খারাপ হবে। মন খারাপ হল ছেলেটির প্রতারণার কৌশলে। বাবার মৃত্যুর কথা বলে সে কাঁদছিল। ভান না, সত্যি সত্যি কাঁদছিল — চোখ বেয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছিল। আমরা নানাভাবে মানুষকে প্রতারিত করি — বাবা-মা'র মিথ্যা মৃত্যুর কথা বলে মানুষকে প্রতারিত করি না। তাছাড়া প্রতারকের চোখে কখনো অশ্রু টলমল করে না।

তাহলে কি ছেলেটি সত্যি কথাই বলেছে? ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ-খবর করতেও আমার লজ্জা লাগল। যদি ব্যাপারটা সত্যি হয় তাহলে ভদ্রমহিলা কি মনে করবেন? তিনি কি ভাববেন না সামান্য দু'হাজার টাকা দিয়ে সে খোঁজ-খবর শুরু করেছে?

মনের ভেতর একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল। সেদিন সন্ধ্যায় শীলাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা, আজ কি তোমাদের ক্লাস টিচার '. . .' এসেছিলেন?

সে বলল, হুঁ।

'ক্লাস নিয়েছেন?'

'হুঁ। ক্লাস নেবেন না কেন?'

'হাসি-খুশি ছিলেন?'

'শিক্ষরা কখনো হাসিখুশি থাকে না। শিক্ষকরা গম্ভীর থাকে।'

'আমার মনটা গ্লানিতে ভর্তি হয়ে গেল। একটা নষ্ট ছেলে আমাকে বোকা বানিয়ে চলে গেছে! সে ব্যবহার করেছে একজন শিক্ষিকার নাম। সেই শিক্ষিকাকেও ব্যাপারটা জানানো দরকার।

কাজেই আমি তাঁকে জানালাম। তিনি অসম্ভব ব্যথিত হলেন এবং বললেন — যে ছেলে আপনার কাছে গিয়েছিল সে বাইরের কেউ না। সে আমারই ছেলে।

'সে কি?'

'সে ড্রাগ ধরেছে। ড্রাগের টাকার জন্যে নানান কৌশল বের করে। আমার ছাত্রীদের কাছে যায় . . .'

ভদ্রমহিলার চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে গেল। তিনি চোখ মুছে বললেন, আমি

আপনার টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

আমি বললাম, টাকা দিতে হবে না। আপনি ছেলেটির চিকিৎসা করান।

তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন — অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। কিছুদিন ভাল থাকে তারপর আবার শুরু করে। আজ এই ড্রাগ আমার ছেলেকে ধরেছে — আস্তে আস্তে সবাইকে ধরবে। কি ভয়ংকর সময়ের দিকে যে দেশটা যাচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে না! কেউ না! আপনি লেখক মানুষ, আপনিও বুঝছেন না। বুঝলে ড্রাগ বিষয়ে কিছু লিখতেন।

ভদ্রমহিলা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

একালের শবে বরাত

আমি যখন ছোট ছিলাম তখনো শবে বরাত উৎসব হতো, এখনো হচ্ছে। তবে উৎসব পালন প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। একালের ছেলেমেয়েদের আমাদের সময়কার উৎসবটির কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

আজ আইন করে পটকা ফুটানো নিষেধ করা হচ্ছে। আমাদের সময়ে এই আইনের প্রয়োজন হয়নি। এক সপ্তাহ আগে থেকেই পাড়ায় পাড়ায় পটকার দোকান। ছোটদের প্রিয় ছিল তারাবাতি, কাঠির আগায় পটকা, মার্বেল পটকা। একটু বখাটে ধরনের ছেলেদের জন্যে মরিচ বাতি। কাঁচা মরিচ সাইজের হাউই। দেয়াশলাই-এ আগুন লাগাতে হয় — আগুন লাগানোমাত্র শাঁ করে আকাশে উড়ে যায়।

সে সময় ছেলেমেয়েদের বাবারা পটকা কিনে দিতেন। কিছু তারাবাতি, কিছু লাঠি-পটকা, কিছু মার্বেল পটকা। মনে আছে কাঠি-পটকা হাতে আমরা গম্ভীর ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াতাম। কিছুক্ষণ পর পর গোণা হত — মোট ক'টা পটকা আছে। তারাবাতির প্যাকেট থাকত বুক পকেটে। যখন-তখন পকেট থেকে তারাবাতির প্যাকেট বের করে বাতির সংখ্যা গোণা ছিল অবশ্যকর্তব্যের একটি।

পটকার দোকানে মোমবাতিও বিক্রি হত। শবে বরাতের সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা। হালুয়ার ব্যাপারটা ছিল কি-না মনে পড়ছে না, হয়তো ছিল। তবে গোশত-রুটির কথা মনে আছে। চালের আটার রুটি এবং প্রচুর ঝাল দিয়ে রাঁধা গরুর মাংস। ঝোলে কব্জি পর্যন্ত ডুবিয়ে রুটি খাওয়া শবে বরাতের অবশ্য করণীয় কর্মকাণ্ডের একটি।

রাতের খাওয়ার পরই গোসল। হাড়-কনকনে শীতে গোসল সারতে হতো। গরম পানি না, পুকুরে। কারণ গোসল করে পাড়ে উঠার পর গা থেকে গড়িয়ে পড়া পানিতে যত ঘাস ভিজত তত সোয়াব। সোয়াব বাড়ানোর জন্যে ভেজা গায়ে ঘাসের উপর ছোটাছুটি করার কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে।

নামাজ শুরু হলো একটু রাত করে। মেঝেতে পরিষ্কার একটা চাদর বিছানো হতো। আমরা ছোটরা বাবার পেছনে নামাজে দাঁড়াতাম। ছোটদের নামাজ দরকার নেই — বাবা যেমন করছেন তেমন করলেই সোয়াব। আমাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা মজার খেলার মত। সেজদায় গেলে মাথা থেকে টুপি পড়ে যেত। সেই টুপি চট করে মাথায় দেয়া এবং হাত বাড়িয়ে ছোট ভাইয়ের মাথা থেকে টুপি ফেলে দেয়াতেই সময় কাটত।

সারারাত নামাজ পড়তে হবে এই জাতীয় পরিকল্পনা নিয়ে শুরু করলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম। যে কোন কারণেই হোক শবে বরাতের রাতে আমাদের খাটে নিয়ে শোয়ানো হতো না। নামাজের চাদরেই আমরা শুয়ে

থাকতাম। শুধু চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হতো। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যেত। আধো-ঘুম, আধো-জাগরণে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতাম — বাবা নামাজ পড়ছেন। মা তাঁর পাশেই রেহেলে কোরান শরীফ রেখে পাঠ করছেন। ইলেকট্রিক বাতি নিভিয়ে ঘরে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। আগরদানে আগরবাতি পুড়ছে। যেন অলৌকিক এক দৃশ্য। বাবা নামাজের ফাঁকে ফাঁকে উঠে এসে তাঁর পুত্র-কন্যাদের গায়ে দোয়া পড়ে ফুঁ দিতেন। দীর্ঘ ফুঁ — মাথা থেকে পা পর্যন্ত। আবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। শবে বরাত এলেই মনে পড়ে এই মঙ্গলময় ফুঁ দেয়ার জন্যে বাবা বেঁচে নেই। মন বিষণ্ন হয়।

প্রতি শবে বরাতের রাতেই বাবার স্মৃতি মনে করেই হয়তো গভীর রাতে আমার বাসাতেও মেঝেতে একটা ঢালাও বিছানা করা হয়। বাবার মত নামাজ পড়ে প্রার্থনা করি। কিন্তু কিছুতেই সেই আগের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারি না।

এবারে শবে বরাতে ভেবেছিলাম বাচ্চাদের কিছু তারাবাতি কিনে দেব। কোথাও তারাবাতি পেলাম না। শুনলাম সরকারী নির্দেশে পটকার দোকান নিষিদ্ধ। খোলা বাজারে পাওয়া যাবে না। তবে 'বন্ধ-বাজারে' পাওয়া যাবে।

'বন্ধ-বাজার' খোঁজার ইচ্ছা হলো না। তবে যাদের খোঁজার তারা ঠিকই খুঁজে বের করল। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হল তাণ্ডব। পটকা তো নয়, যেন 'এটম বোমা' ফাটছে। একেকটা পটকা ফুটে ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা কেঁপে উঠে। সেই সঙ্গে চলল মাইক। প্রার্থনা খুবই ব্যক্তিগত বিষয়, নীরব বিষয়। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে সেই ব্যক্তিগত নীরব প্রার্থনা সরব আকার ধারণ করল। যা শুরু হল তার নাম প্রার্থনা নয়, কোরান পাঠ নয় — তার নাম হট্টগোল।

আমি আমার এলিফেন্ট রোডের এ্যাপার্টমেন্টের বারান্দায় বসে আছি, নতুন দিনের শবে বরাত উৎসব পালন দেখছি। এ কি ভয়াবহ উৎসব! হচ্ছেটা কি?

অনেকগুলি খণ্ড দৃশ্য দেখলাম। একটা বর্ণনা করি। রাত এগারটা কিংবা সাড়ে এগারটা। এলিফেন্ট রোড ধরে এক ভদ্রলোক তাঁর কন্যা কিংবা কন্যা-স্থানীয় কাউকে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে কোত্থেকে একটা ছেলে এসে রিকশাওয়ালার সামনে বিকট শব্দে একটা বোমা ফাটাল। রিকশাওয়ালা রিকশা থামাল। তখন শুরু হল বৃষ্টির মত বোমা-বৃষ্টি। রিকশার চারদিকে ফাটছে। মেয়েটি কাঁদছে। মেয়ের সঙ্গী হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে ছেলেগুলির দিকে তাকাচ্ছেন। ছেলেরা ক্ষমা করবে কেন? তারা ক্ষমা করতে আসেনি, তারা এসেছে মজা করতে। কাজেই তারা মজা করেই যেতে লাগল।

আমেরিকায় হেলোইন উৎসব বলে একটা উৎসব হয়। ছোট ছোট বাচ্চা-কাচ্চারা ভূতের মুখোশ পরে বাড়ি বাড়ি যায়। কলিংবেল টিপে বলে — ট্রিট অর ট্রিক (কিছু দাও নয়ত ভয় দেখাব)। ঘরের লোকজন ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করে তাড়াতাড়ি মুঠো ভর্তি চকোলেট এনে দেয়। সেই মজার উৎসবের ভয়াবহ বিবর্তন হয়েছে। আজ হেলোইন উৎসবের কথায় আমেরিকাবাসী আঁতকে উঠে। প্রতি স্টেটে স্পেশাল পুলিশ ফোর্স

নামানো হয়। কারণ বর্তমানের হেলোইন উৎসবে মজা করার জন্যে বাড়িতে লোককে বাইরে থেকে ঘরে আটকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। উৎসবটা এখন আর মজার ভয় দেখানো পর্যায়ে নেই। এখন ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলার পর্যায়ে। হেলোইন উৎসবের পর পর আমেরিকার খবরের কাগজগুলি উৎসবে হত্যার সংখ্যা প্রকাশ করে। সেই সংখ্যা পড়ে যে কোন মানুষ আঁতকে উঠবেন।

আমেরিকা যে পথে যাবে — আমারও তো সেই পথেই যাব। নয়তো সভ্য বলে নিজেদের পরিচয় দেব কি করে? 'শবে বরাতের বলি' শিরোনামে কাগজ এখন খবর ছাপা শুরু করেছে। ভোরের লাগজ লিখেছে — গ্রেপ্তার ৬০০, আহত ৩৬৫। সবে শুরু। ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে!

ভবিষ্যতের শবে বরাত উৎসবে স্পেশাল পুলিশ বা রায়ট পুলিশ চলবে না — আর্মি নামাতে হবে, ট্যাঙ্ক নামাতে হবে। ধর্মীয় উৎসব কি ভাবে পালন করতে হয় আমরা তা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে ছাড়ব।

আমরা কোথায় চলেছি?

ভদ্রলোক একজন সিএ। নিজের ফার্ম আছে। ভাল রোজগার করেন। ছেলেমেয়েরা সব বড় হয়ে গেছে। তাঁর সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পড়ছে। অতি সজ্জন মানুষ। বিনয়ী, ভদ্র এবং খানিকটা লাজুক ধরনের। তিনি তাঁর মেয়েকে নিয়ে বাসায় ফিরছিলেন। ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে, তাঁরা দু'জন পেছনের সীটে বসেছেন। গল্পগুজব করছেন। গাড়ি বড় রাস্তা ছেড়ে বাইলেনে ঢুকল। ট্রাফিক জ্যাম। ড্রাইভারকে আস্তে আস্তে এগুতে হচ্ছে — হঠাৎ দুর্ঘটনা — একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠল। তার পায়ের পাতার উপর দিয়ে গাড়ি চলে গেছে। ছেলেটি চেঁচাচ্ছে — মেরে ফেলেছে! আমাকে মেরে ফেলেছে!

ভদ্রলোক ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন। ড্রাইভার বলল, স্যার, এই ছেলে বদমায়েশী করছে। গাড়ি ওর পায়ের উপর দিয়ে যায় নাই।

'তুমি থাম।'

ড্রাইভার গাড়ি থামাল। দেখতে দেখতে লোক জমে গেল। ছেলেটি দেখা গেল একা নয়। সঙ্গে অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে। তারা হুংকার দিচ্ছে — ভাঙ, গাড়ির কাচ ভাঙ। হারামজাদাকে টাই ধরে নামা।

তিনি বিব্রত। সঙ্গে তরুণী মেয়ে। ছেলেরা যেসব ভাষা ব্যবহার করছে তা নিজের কন্যাকে পাশে নিয়ে শোনা যায় না। তিনি বললেন, তোমার পায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চলে গিয়ে থাকলে খুব অন্যায় হয়েছে। তুমি উঠে বস। আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

'চুপ থাক শালা। টেকা বের কর, ক্ষতিপূরণ দে। পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ।'

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তাঁর কন্যা কাঁদতে শুরু করল। এতগুলি মানুষ চারদিকে। কেউ কিছু দেখছে না। সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তিনি কি করবেন ভেবে পেলেন না। সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকাও নেই। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, এত টাকা সঙ্গে নেই।

'না থাকলে গাড়ি রেখে যা। টাকা দিয়ে গাড়ি ছাড়িয়ে নিবি।'

একজন অসহিষ্ণু গলায় বলল, দেরি করছ কেন? একটা ইট এনে গাড়ির কাচ ভাঙা শুরু কর।'

ভদ্রলোক মানিব্যাগে যা টাকা ছিল সব দিলেন। হাতের ঘড়ি খুলে দিলেন। মেয়েটি সমানে কাঁদছে। তিনি মেয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন —

"এই দিন তো দিন নয় আরো দিন আছে
এই দিনেরে নিবে তোমরা সেই দিনেরো কাছে।"

গল্পটা আমি মেয়েটির কাছ থেকে শুনি। আমাকে এই গল্প শোনানোর তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে — আমাকে জানানো যে তার বাবা চরম দুঃসময়ে আমার ব্যবহৃত দু'টি কবিতার চরণ আবৃত্তি করেছেন।

সমস্যা হচ্ছে, কবিতার চরণ কি সমস্যার সমাধান? আমরা কোথায় চলেছি? মানুষের যাত্রা সব সময় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আমরা কি অন্ধকারে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি? তরুণ ছেলেরা এ কী খেলায় মেতেছে? সমাজে প্রতারক থাকে। কিন্তু তরুণ ছেলেদের এই ভূমিকায় আমরা তো আগে কখনো দেখিনি। এদের চোখে থাকবে স্বপ্ন। এদের মনে থাকবে আশা ও আনন্দ। আজ এদের হৃদয়ে অন্ধকার জমাট বাঁধতে শুরু করেছে।

কাঠগড়ায় কাদের আগে দাঁড় করাব? ঐ সব ছেলেদের বাবা-মা'দের? নাকি শিক্ষকদের? নাকি দেশের কবি-সাহিত্যিকদের?

এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ জন্মায় হৃদয়ে জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে। সেই প্রদীপ যেন সারা জীবন জ্বলতে পারে সে জন্যে বাবা-মা'রা প্রদীপে তেল ঢেলে দেন। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনরাও এই কাজটি করেন। পরবর্তী সময়ে শিক্ষকরা এই দায়িত্ব পালন করেন। দেশের কবি-সাহিত্যিকরাও এই কাজটি পরোক্ষভাবে করেন। তাহলে কি ধরে নেব, প্রদীপে তেল ঢালার কাজটি আমরা করতে পারছি না? প্রদীপ যখন পূর্ণ জ্যোতিতে জ্বলার কথা, তখন তা নিভে যাচ্ছে।

দিনে দুপুরে সবার চোখের সামনে মেয়েদের গলার চেইন ধরে টান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখছি, কিন্তু এগিয়ে আসছি না। একটি প্রতিবাদের বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে না। কেন? আমরা কি মানসিকভাবে এইসব অপরাধ জীবনের অংশ হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছি?

হাইওয়েতে এক্সিডেন্ট হয়। আহত মানুষটিকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে তার জীবন রক্ষা হবে। কিন্তু কোন গাড়ি থামে না। এক্সিডেন্ট করে একজন মরতে বসেছে, মরুক। আমাকে দ্রুত পৌঁছতে হবে। এ দেশের একজন অভিনেতার স্ত্রীর এমন দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু হয়েছে বলে খবরের কাগজে পড়লাম। রক্তে ভেসে যাওয়া এই মহিলা তাঁর জীবনের চরম সংকটের মুখেও পাশে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন — "তোমরা কেঁদো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিছুই ঠিক হয়নি। একটি গাড়িও থামেনি। মহিলাকে দীর্ঘ পথ নেয়া হয় রিকশায় করে। তিনি মারা যান। যে ক'টি গাড়ি সেই সময় তাঁকে ফেলে রেখে চলে গেছে, তার সব আরোহীদের কি হত্যা-অপরাধে বিচার হওয়া উচিত নয়?

শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষের আজ এ কী পরাজয়? আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সেই মহান বাণী — "Man can be destroyed but not defeated"-এর উল্টোই কেন দেখছি? কেন আমরা বারবার পরাজিত হবার পথ বেছে নিচ্ছি?

একটা গল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম, আরেকটি গল্প দিয়ে শেষ করি। স্থান সেকেণ্ড ক্যাপিটেল। সময় সন্ধ্যা। রিকশা করে একটি একটি মেয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পাশে একটা বেবিটেক্সি এসে থামল। তিন তরুণ বের হয়ে এল। একজনের হাতে ভয়াল ছোরা। তাদের দাবি — গলার চেইন, হাতের চুড়ি খুলে দিতে হবে। মেয়েটি চেইন খুলে দিল, হাতের চুড়ি খুলছে। খোলা যাচ্ছে না। তিন তরুণই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। এই সময় প্রায় সত্তর বছরের একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন — চিৎকার করে বললেন, তোমরা এইসব কি করতেছ? খবরদার বললাম। খবরদার।

ছুরি হাতে তরুণটি ক্রুদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে উঠল — জানে শ্যাষ কইরা দিমু।

বৃদ্ধ বললেন, দাও, জানে শেষ করে দাও। কিন্তু আমার চোখের সামনে আমি অন্যায় হতে দেব না।

দুর্বল অশক্ত শরীরের এই বৃদ্ধ শক্ত গ্রানাইট পাথরের এক দেয়াল হয়ে মেয়েটির সামনে দাঁড়ালেন। ছেলেগুলির সাধ্য কি সেই দেয়াল ভেদ করে! বৃদ্ধ হুংকার দিলেন, এই মেয়ের চেইন ফেরত দাও। এর কাছে মাফ চাও — ততক্ষণে লোক জমে গেছে। একটি পুলিশের গাড়ি এগিয়ে আসছে। যে বেবীটেক্সি করে এরা এসেছিল সেই বেবীটেক্সিওয়ালা তার গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। আর দেরি করা যাবে না। পালিয়ে যেতে হবে।

তারা মেয়েটির চেইন ফেলে দিয়ে লাফিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল।

ঐ বৃদ্ধকে আমি দেখিনি। আমি তাঁর গল্প শুনেছি। আজকে এই লেখার মাধ্যমে আমি দূর থেকে তাঁর পদস্পর্শ করছি। পবিত্র মানুষের স্পর্শে অন্তর পবিত্র হয়। আমরা সবাই অশুচি হয়ে আছি — কিছু পবিত্র মানুষের বড়ই প্রয়োজন আমাদের।

আমার বাবার জুতা

বিজয় দিবসের কতো সুন্দর স্মৃতি মানুষের আছে। সেসব স্মৃতিকথা অন্যকে শোনাতে ভালো লাগে। প্রেমিকার প্রথম চিঠি পাওয়ার গল্প বলার সময় যেমন রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয়, বিজয় দিবসের গল্প বলার সময়ও তাই হয়। আমার বন্ধু *দৈনিক বাংলার* সালেহ চৌধুরীকে দেখেছি বিজয় দিবসের স্মৃতিকথা বলার সময় তাঁর চোখে পানি এসে পড়ে। যদিও তেমন কিছু উল্লেখ করার মতো স্মৃতি নয়। তিনি তাঁর মুক্তিযোদ্ধা দলবল নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শুনলেন দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। যুদ্ধের অবসান হয়েছে, আর গুলি ছুঁড়তে হবে না। তিনি রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদতে শুরু করলেন। এই গল্প বলার সময় কেউ কাঁদতে শুরু করলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

আমার দূর সম্পর্কের এক চাচা বিজয় দিবসের স্মৃতি এভাবে বলেন, খবরটা শোনার পর কানের মধ্যে 'তবদা' লেগে গেল। তার কিছুই কান দিয়ে ঢুকে না। আমি দেখছি সবার ঠোঁট নড়ে, কিন্তু কিছু শুনি না। আজব অবস্থা!

১৬ ডিসেম্বর কাছাকাছি এলেই পত্রিকাওয়ালারা বিজয় দিবসের স্মৃতিকথা ছাপানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা কখনোই ভাবেন না, সেদিনের কথা যথাযথভাবে বলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সেদিন আমরা সবাই ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ঘোরের স্মৃতি হলো এলোমেলো স্মৃতি। ঘোরের কারণে তুচ্ছ জিনিসকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। মস্তিষ্ক খুব যত্ন করে তার মেমোরি সেলে তুচ্ছ জিনিসগুলো রেখে দেয়। আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সে অদরকারি মনে করে ফেলে দেয়।

একজন মাতালকে নেশা কেটে যাবার পর যদি জিজ্ঞেস করা হয়, নেশা করার ঐ রাতে তুমি মদ্যপান ছাড়া আর কী করেছিলে? সে পরিষ্কার কিছু বলতে পারবে না। বলতে পারার কোনো কারণ নেই। বিজয় দিবসে আমরা সবাই এক প্রচণ্ড নেশার মধ্যে ছিলাম। কাজেই, হে পত্রিকা সম্পাদক, আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। জিজ্ঞেস করলেই আমরা উল্টাপাল্টা কথা বলবো। আপনার ধারণা হবে আমরা মিথ্যা কথা বলছি। কিন্তু আমরা কেউ মিথ্যা বলছি না। দেশের স্বাধীনতা নিয়ে কি আর মিথ্যা গল্প করা যায়?

আজ আমি বিজয় দিবসের স্মৃতির গল্প করবো না। আমি বরং আমার বাবাকে নিয়ে একটি গল্প বলি। এই মহান ও পবিত্র দিনে গল্পটি বলা যেতে পারে।

আমার বাবার এক জোড়াই জুতা ছিল। লাল রঙের চামড়ার জুতা। মাল্টিপারপাস

জুতা। সাধারণভাবেও পরতেন, আবার তাঁর পুলিশের ইউনিফর্মের সঙ্গেও পরতেন। জুতা জোড়ার সঙ্গে আমরা খুব পরিচিত, কারণ আমাদের প্রায়ই তাঁর জুতা কালি করতে হতো। কাজটা আমাদের খুব পছন্দের ছিল। জুতার কালির গন্ধটা খুব মজা লাগতো। আবার ব্রাশ ঘষতে ঘষতে জুতা যখন ঝকঝকে হয়ে উঠতো, তখন দেখতে ভালো লাগতো। সবচেয়ে বড় কথা — ঝকঝকে জুতা দেখে বাবা বলতেন, আরে বাপ রে, একেবারে আয়না বানিয়ে ফেলেছে। এই বাক্যটি শুনতেও বড় ভালো লাগতো।

১৯৭১ সালের ৫ মে আমার বাবা তাঁর লাল জুতা পরে বরিশালের গোয়ারেখো গ্রাম থেকে বের হলেন। সেদিন জুতা জোড়া কালি করে দিলো আমার ছোট বোন। বাবা যথারীতি বললেন, 'আরে বাপ রে, একেবারে আয়না বানিয়ে ফেলেছিস।' সেই তাঁর জুতা পরে শেষ বের হয়ে যাওয়া।

সন্ধ্যার সময় খবর এলো — বলেশ্বর নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে মিলিটারিরা তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। মানুষকে যে এতো সহজে মেরে ফেলা যায়, তা আমার মা তখনো জানতেন না। তিনি খবরটা বিশ্বাস করলেন না। তিনি আমাদের ডেকে বললেন, তোরা এই লোকগুলোর কথা বিশ্বাস করিস না। তোর বাবা সারা জীবনে কোন পাপ করেনি। এ রকম মৃত্যু হতে পারে না। তোর বাবা অবশ্যই বেঁচে আছে। যেখানেই থাকুন তিনি যেন সুস্থ থাকেন, এই দোয়া করি। আমি জানি তোর বাবার সঙ্গে তোদের আবার দেখা হবে অবশ্যই।

একজনের বিশ্বাস অন্যের মধ্যে সংক্রমিত হয়। আমরা সবাই মা'র কথা বিশ্বাস করলাম। এর মধ্যে মা এক রাতে স্বপ্নেও দেখলেন, মিলিটারিরা বাবাকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে সেখানেই এক জেলে আটকে রেখেছে। বাবা স্বপ্নে মাকে বললেন, 'দেশ স্বাধীন হলেই এরা আমাকে ছেড়ে দেবে। তখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। এই ক'দিন একটু কষ্ট করে থাক।'

মা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিছুই খেতে পারতেন না। এই স্বপ্নের পর আবার অল্পস্বল্প খেতে শুরু করলেন। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম স্বাধীনতার দিনটির জন্য। আমরাও মার মতোই ধরে নিয়েছিলাম, দেশ স্বাধীন হলেই বাবাকে পাওয়া যাবে। মার প্রতি আমাদের এই অবিচল বিশ্বাসের কারণও আছে। আমার মা কখনোই তাঁর ছেলেমেয়েদের কোনো ভুল আশ্বাস দেননি।

আমরা তখন গ্রামে পালিয়ে আছি। মে মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে। ঘোর বর্ষা। দিনের পর দিন একনাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তখন অদ্ভুত একটা খবর পাওয়া গেলো। এক লোক নাকি বলেশ্বর নদী দিয়ে ভেসে যাওয়া একটা লাশ তুলে কবর দিয়েছে। তার ধারণা, এটা পিরোজপুরের পুলিশ প্রধান ফয়জুর রহমান আহমেদের লাশ। সে লাশটা

কবর দিয়েছে, তবে প্রমাণের জন্য লাশের পা থেকে জুতা জোড়া খুলে রেখেছে। এই জুতা জোড়া সে আমাদের হাতে তুলে দিতে চায়। আমার মা বললেন, অসম্ভব! এটা হতেই পারে না। নিশ্চয়ই অন্য কারো জুতা। তবু পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হবার জন্য আমাকে জুতা আনতে শহরে পাঠালেন। আমাকে পাঠানোর কারণ হলো, আমার মার ধারণা, আমি খুব ভাগ্যবান ছেলে। আমি কখনো অমঙ্গলের খবর আনবো না।

মিলিটারিতে তখন পিরোজপুর গিজগিজ করছে। এই অবস্থায় কোনো যুবক ছেলের শহরে ঢোকা মানে জীবন হাতে নিয়ে ঢোকা। তার উপর শুনেছি, মিলিটারিরা আমাকে এবং আমার ছোট ভাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমি শহরে গেলাম লুঙ্গি, পাঞ্জাবি এবং টুপি মাথায় দিয়ে, যেন কেউ চিনতে না পারে। ঐ লোককে খুঁজে বের করলাম। আমাকে জুতা জোড়া দেওয়া হলো। হ্যাঁ, আমার বাবারই জুতা। ভুল হবার কোনোই কারণ নেই। জুতা নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরলাম। আমার মা জুতা দেখলেন। তিনিও বুঝলেন এটা কার জুতা, তারপরও বিশ্বাস করলেন না। এরকম জুতা তো কতো মানুষেরই থাকতে পারে। তিনি আমাদের বললেন, জুতা দেখে তোরা মন খারাপ করিস না। এটা মোটেই কোনো জোরালো প্রমাণ না। জুতা জোড়া কাগজে মুড়ে এক কোণায় রেখে দেওয়া হলো।

দেশ স্বাধীন হবার পর পর মা ঢাকা থেকে পিরোজপুর গেলেন। নদীর পাড়ে যেখানে বাবাকে কবর দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে, সেই জায়গা নিজে উপস্থিত থেকে খোঁড়ালেন। কবর থেকে লাশ তোলা হলো। শরীর পচে-গলে গেছে, কিন্তু নাইলনের মোজা অবিকৃত। মা পায়ের মোজা, দাঁত, মাথার চুল দেখে বাবাকে শনাক্ত করলেন। দীর্ঘ ছ'মাস পর তিনি স্বীকার করলেন, তাঁর স্বামী বেঁচে নেই।

তিনি ঢাকায় ফিরে এলেন। আমাদের যে এতোদিন মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেলন। আমার সবচেয়ে ছোট বোনটি অসুস্থ। সে কথা বলতে পারে না, কানেও শোনে না। মা আমার ছোট ভাইকে বললেন তাকে যেন বাবার মৃত্যুর ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলা হয়।

সন্ধ্যাবেলা মা কাগজের মোড়ক থেকে জুতা জোড়া বের করলেন। অনেক সময় নিয়ে পরিষ্কার করলেন। লাল কালি কিনে এনে জুতা কালি করা হলো। আমরা দেখলাম, তাঁর বিছানায় বালিশের পাশে জুতা জোড়া রাখা হয়েছে। সেই রাতে তিনি বাবার জুতা জোড়া জড়িয়ে ধরে বিছানায় শুতে গেলেন।

আজকের এই মহা আনন্দের দিনে আমি আপনাদের আমার একটি ব্যক্তিগত কষ্টের গল্প বললাম। আমার এই কষ্ট যেন আপনাদের আনন্দকে কোনোভাবেই ছোট না করে। আজকের দিনে কষ্টের কোনো স্থান নেই। আমার বাবা এই দেশকে

ভালোবেসেছিলেন। আমিও বাসি। অবশ্যই আমার ছেলেমেয়েরাও বাসবে। আজকের দিনে এই ভালোবাসাই সত্য, আর সব মিথ্যা।

প্রতি বছর বিজয় দিবস আসে, আমি নিজের হাতে বাসায় একটা পতাকা টানাই। পতাকাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে বড় ভালো লাগে। আমার কী সৌভাগ্য, স্বাধীন দেশের পতাকা নিজের হাতে উড়াচ্ছি!

আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব,
ফুরায়ে গেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।

গ্রীন বয়েজ ফুটবল ক্লাব

ছোটবেলায় আমি একটা ফুটবল দল করি। দলের নাম গ্রীন বয়েজ ফুটবল ক্লাব। সে সময় বাংলা নিয়ে এত মাতামাতি ছিল না। ক্লাবের নাম ইংরেজিতেই হত। আমাদের ক্লাবের প্রধান পেট্রন ছিলেন আমার বড় মামা শেখ ফজলুল করিম। তিনি তখন সিলেট এম সি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়তেন। কখনো ফাইনাল পরীক্ষা দিতেন না বলে বছর ছয়েক ধরে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলেন। পড়াশোনা ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ে তাঁর অসীম উৎসাহ ছিল।

কাজেই আমরা একটা ফুটবল ক্লাব করতে চাই শুনে তিনি তাঁর যাবতীয় প্রতিভা এই দিকে নিবদ্ধ করলেন। ক্লাবের নাম ঠিক করলেন। প্লেয়ারদের জার্সির ডিজাইন করলেন। সবুজ রঙের শার্ট, শাদা কলার, শাদা প্যান্ট এবং শাদা কেডস জুতা। জার্সি বা কেডস জুতা কেনার সামর্থ আমাদের ছিল না। বড় মামা বললেন, একদিন হবে। তখন যেন ডিজাইনের জন্যে বসে থাকতে না হয়। ক্লাবের নিয়মকানুন ঠিক করে সব ফুলস্ক্যাপ কাগজে লিখে ফেলা হল। সদস্যদের জন্যে চার আনা মাসিক চাঁদা নির্ধারিত হল। ক্লাবের নিয়ম ভঙ্গ করলে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হল।

সবই হল, সমস্যা একটাই। আমাদের কোন বল নেই। চাঁদা যা উঠেছে, তাতে বল হয় না। বড় মামা যে সাহায্য করবেন, সে উপায় নেই। বাড়ি থেকে তাঁকে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমার নানাজান ঘোষণা করেছেন, দুষ্ট গরুর পেছনে আর অর্থ ব্যয় করবেন না। বড় মামাকে নানান ফন্দি-ফিকির করে নিজের চা-সিগ্রেটের খরচ যোগাড় করতে হয়।

আমরা ক্লাব করে বিষণ্ন হয়ে ঘোরাফেরা করি। বল নেই। বল পাওয়া যাবে সে সম্ভাবনাও নেই। এদিকে বর্ষা নেমে গেছে। আমাদের পাশের পাড়ার ছেলেরা রয়েল বেঙ্গল টাইগার ক্লাব বানিয়ে ফুটবল নিয়ে মাঠে নেমে গেছে। বড় মামা আমাদের সান্ত্বনা দেন, ক্লাব তৈরি করাটাই আসল, বল কোন ব্যাপার না। তোমরা প্র্যাকটিস কর।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, বল ছাড়া কিভাবে প্র্যাকটিস করব?

মামা বড়ই বিরক্ত হলেন, প্র্যাকটিস করতে বল লাগবে কেন? দৌড়ের প্র্যাকটিস লাগবে, দম রাখার প্র্যাকটিস লাগবে। ল্যাং মারা শিখতে হবে। কাচ্চি মারা শিখতে হবে। দৌড়ের সময় কনুই দিয়ে গুঁতা মেরে বিপক্ষের প্লেয়ার ফেলে দেওয়ার ট্রেনিং নিতে হবে। ফুটবল তো কোন সহজ খেলা না। খুবই জটিল খেলা।

আমরা মামার নেতৃত্বে প্র্যাকটিস শুরু করে দিলাম। ল্যাং মারা শিখলাম, কাচ্চি মারা শিখলাম। কনুই দিয়ে গুঁতা মারা শিখলাম। তখনকার সময় ফিফার নিয়মকানুন ছিল না। ফুটবলের মাঠে ফাউল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হত। রেফারি এইসব ক্ষেত্রে

বলতেন, "আরে এটা তো মেয়েছেলের লুডু খেলা না। একটু-আধটু লাগবেই। খেলায় যদি এক দু-একজনের হাত-পা না ভাঙল তবে কিসের খেলা?"

মারামারি বিষয়ক পুরোপুরি ট্রেনিং প্রাপ্তির পর কে কোন পজিশনে খেলব তাও মামা ঠিক করে দিলেন। গাঁট্টাগোট্টা চেহারার জন্যে মজনুকে করা হল ফুল ব্যাক। মামা তার নাম বদলে দিয়ে নতুন নাম রাখলেন — জুম্মা খাঁ। মামা মজনুকে ডেকে নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, ভাল মত বল আটকাবি। পেনাল্টি এরিয়ার ধারে কাছে যেন বল না আসতে পারে। ঠিকমত খেলতে পারলে তোর টাইটেল দিয়ে দেব চীনের প্রাচীর। গ্রেট ওয়াল অব চায়না।

তবু আমাদের বিষণ্ন ভাব কাটে না। অন্য দল আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করে। বল নেই, ফুটবল ক্লাব। হাসাহাসি করারই কথা। তারচেয়েও দুঃখের ঘটনা ঘটে গেল — শ্রাবণ মাসের গোড়ার দিকে আমাদের জুম্মা খাঁ রয়েল বেঙ্গল ক্লাবে চলে গেল। ওদের ব্যাক হয়ে ধুমসে খেলতে লাগল। অন্যরাও উসখুস করতে লাগল। বড় মামা মিটিং করে মজনুকে চিরজীবনের জন্যে দল থেকে বহিষ্কার করলেন। তাতে মজনুকে তেমন বিচলিত হতে দেখা গেল না। বরং মনে হল খুশিই হল। আমাদের সঙ্গে দেখা হলে দাঁত বের করে হাসে।

দলের মোরালের যখন এই অবস্থা তখন মোরাল ঠিক করার জন্য বড় মামা ম্যাচ ডিক্লেয়ার করে দিলেন। সিলভার কাপের খেলা। কাপের নাম — "শেখ ফজলুল করিম সিলভার কাপ"। লীগ পদ্ধতিতে খেলা হবে। যে পার কাপ জিতে নাও। উৎসাহ কিছুটা ফিরে এল, যদিও তখনো ফুটবলের দেখা নেই।

আমার বাবা তখন দিনাজপুরের জগদলে। তাঁর কাছে ফুটবল কেনার টাকা চেয়ে ছোটবোনকে দিয়ে একটা চিঠি লেখালাম। কারণ, বাবা তাঁর মেয়েকে অসম্ভব ভালবাসেন। তিনি মেয়ের আবদার রাখবেন না, তা হতেই পারে না। বাবা সেই চিঠির উত্তরে লিখলেন — মা, মেয়েরা তো ফুটবল খেলে না। তুমি ফুটবল কেন কিনতে চাচ্ছ তা বুঝলাম না।

এদিকে ম্যাচের দিন ঘনিয়ে এসেছে। শুক্রবার খেলা। প্রথম দিনেই আমাদের খেলা পড়েছে রয়েল বেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে। আমাদের ফুটবল নেই। তাতে তেমন অসুবিধা হবে না, ওদের আছে। সেই ফুটবলে খেললেই হবে। প্রধান সমস্যা বড় মামার ঘোষণা করা সিলভার কাপেরও খোঁজ নেই। আমরা কিছু জিজ্ঞেস করলেই মামা রেগে যান। বিরক্ত গলায় বলেন, হবে হবে। এত অস্থির হচ্ছিস কেন? যথাসময়ে কাপ চলে আসবে। কাপ দেখে তোদের চোখ কপালে উঠে যাবে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কাপ চলে এল। সেই কাপ দেখে সত্যি আমাদের চোখ কপালে উঠে গেল। সেই চোখ আর কপাল থেকে নামতে চায় না। বিশাল কাপ। কাপের গায়ে ইংরেজীতে লেখা S. F. Karim Silver Cup 1955.

আমাদের আনন্দ কে দেখে। সন্ধ্যা বেলাতেই কাপ নিয়ে মিছিল। মিছিলের

পুরোভাগে আছেন বড় মামা। কি ভয়ংকর উত্তেজনা! কি আনন্দ! রাতে এক ফোঁটা ঘুম হল না।

প্রথম দিনের খেলায় রয়েল বেঙ্গল ক্লাব দুই গোলে হেরে গেল। বড় মামার দিকে তাকিয়ে দেখি, আনন্দে তিনি কাঁদছেন। রুমালে ঘন ঘন চোখ মুছতে মুছতে বলছেন, চোখে আবার কি পড়ল। কি যন্ত্রণা!

সিলেট শহরে ছোটদের মধ্যে এই কাপ দারুণ হৈ-চৈ ফেলে দিল। ছোটদের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল বড়দের মধ্যে। ফাইনালের দিন রীতিমত উৎসব। অনেক স্কুল ছুটি হয়ে গেল। খেলা দেখতে এলেন ডিসি, এসপি, গণ্যমান্য লোকজন। প্রধান অতিথি হয়ে এলেন এম সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেব।

সে বছর মামা আবারো আই. এ. পরীক্ষা দিলেন না। কারণ সিলভার কাপ কেনার জন্যে তিনি তওর কলেজের যাবতীয় বই এবং তাঁর অতিপ্রিয় হারকিউলিস সাইকেল বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

কিছুদিন ধরেই রাত জেগে ওয়ার্ল্ড কাপ দেখছি। সোনার তৈরি কাপটি যতবার পর্দায় দেখায় ততবারই আমার বড় মামার কাপটির কথা মনে হয়। আমার এই মামা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তারপরেও টিভি পর্দায় সোনার কাপটি দেখলেই আমার মন বলে — না, পৃথিবী তাঁকে পুরোপুরি পরাজিত করতে পারেনি। বিশ্বকাপের আয়োজকদের দীর্ঘ তালিকায় অদৃশ্য অক্ষরে তাঁর নাম লিখতে হয়েছে। এই বা কম কি?

আমার বন্ধুরা

বইমেলার সময় শেষ।

সাতটাতেই সময় শেষ হয়, এখন বাজছে ন'টা।

'কোথাও কেউ নেই' নামের স্টলে বসে আছি। হলুদ পর্দা ফেলে দেয়া হয়েছে। চা এসেছে, ঝালমুড়ি এসেছে।

চা, ঝালমুড়ি, সিগারেট সমানে খাওয়া হচ্ছে। দিনের ক্লান্তির শেষে জমিয়ে আড্ডা দেয়া। অতি সামান্য রসিকতাতেই আমরা হো হো করে হাসছি। মনে হচ্ছে এই জীবনটা তো খুব খারাপ না।

এমন এক আনন্দময় সময়ে মনে পড়ল জনৈক তরুণ আমাকে একটা স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'বাসায় গিয়ে পড়বেন।'

স্লিপে মজার কিছু থাকতে পারে, মজার সেই ব্যাপার নিয়ে সবাই আরো আনন্দ করতে পারেন ভেবে স্টলে বসেই স্লিপটা পড়লাম। মুহূর্তেই সমস্ত আনন্দ বাতাসে মিশে গেল। স্লিপটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললাম — আমার বন্ধুরা যেন সেই লেখা পড়তে না পারেন। যে আনন্দ-মুহূর্ত আমরা তৈরি করেছি — স্লিপের এই লেখা সেই আনন্দকে বিষাক্ত করে তুলবে।

আড্ডার একজন বললেন, কি লেখা?

আমি বললাম, গালাগালি।

অভিনেতা মোজাম্মেল হোসেন বললেন, চিঠি লিখে গালাগালি কেন? মুখে গালাগালি করলেই হয়। গালাগালি যদি কেউ শুনতেই না পেল, তাহলে কিসের গালাগালি?

সবাই হাসতে শুরু করল। আমিও হাসছি। আড্ডার আনন্দধারা প্রবাহিত হচ্ছে আমি সেই ধারায় নিজেকে যুক্ত করতে পারছি না। স্লিপের সামান্য কয়েক লাইন আমাকে তীব্র যন্ত্রণার মুখোমুখি করে দিল।

না, সেখানে গালাগালি ছিল না। গালাগালিতে আমার কিছু হয় না। আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমার অতি প্রিয়জনরাও আমাকে লিখিতভাবে পত্রিকার ছাপার অক্ষরে এত গালাগালি করেছেন এবং এমন নোংরা ভাষা ব্যবহার করেছেন যে ট্যানারিতে না গিয়েও আমার চামড়া ট্যান হয়ে গিয়েছে। এই চামড়ায় কিছুই লেগে থাকে না। পিছলে যায়। উদাহরণ দিতে পারতাম, ইচ্ছে করছে না। রুচিতে বাধছে।

মানুষের গালাগালি, অপমান এইসব আমি সেধে এনেছি। আমি যদি লেখালেখি না করতাম, যদি নিজের ছোট্ট সংসারে নিজেকে আটকে রেখে জীবন পার করে দিতে পারতাম তাহলে কেউ আমাকে গালাগালিও করত না, অপমান করার সাহসও পেত

না। "ধন নয়, মান নয় এতটুকু বাসা"র ফিলসফি মন্দ নয়।

জীবনের শুরুতে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা এতটুকুই ছিল — তারপর কি যে হল, এক নিশিরাতে আমার ছোট্ট ঘরে জোছনার আলো এসে পড়ল। ইচ্ছে করল জোছনার এই আলোর কথা সবাইকে জানিয়ে দি'। কাগজ এবং কলম হাতে তুলে নিলাম। একদল চোখ লাল করে বললেন — কি লিখছে এসব? গেল গেল, সাহিত্য গেল! বই পাড়া ভর্তি হয়ে গেল জঞ্জালে। "ঘর মে এত্তা জঞ্জাল"। তাঁরা মর্জিনা হয়ে ঝাড়ুর সন্ধানে গেলেন। অতি বিজ্ঞদের একজন, যাঁর জীবনের একমাত্র ব্যর্থতা না কি ব্যর্থতার অভাব, ভুরু কুঁচকে ভাবতে বসলেন— এই সাহিত্যের কি নাম দেয়া যায়? নাম খুঁজেও পেলেন — 'অপন্যাস'। তাঁর মহান আবিষ্কার স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর কাছেই ফিরে গেছে। জীবনের গভীর সত্য অনুসন্ধানের ভান যাঁরা করেন তাঁরা কখনোই সহজ সত্য টের পান না। এও এক অমোঘ জাগতিক নিয়ম।

যাই হোক। স্লিপের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সেখানে লেখা —

হুমায়ূন সাহেব,

আপনাকে সব সময় ঘিরে থাকে একদল মূর্খ প্রকাশক এবং কিছু শিক্ষিত মূর্খ চাটুকার। মোসাহেব ছাড়া আপনি চলাফেরা করতে পারেন না। আপনার সবচে' ক্ষতি করছে স্তাবকরা এবং মূর্খ প্রকাশকরা। এদের ত্যাগ করুন। আখেরে ভাল হবে।

অথচ আমার চারপাশে যারা বসে আছেন এঁরা আমার অতি প্রিয়জন। লেখালেখি করতে গিয়ে আমি তো সবই ত্যাগ করেছি। আর কত? আমার পাশে বসে আছেন সাংবাদিক সালেহ চৌধুরী। আমরা স্তাবকতা করে তাঁর কিছু পাবার নেই। আছেন কবি হাসান হাফিজ। তাঁর থাকা উচিত ছিল কবিদের সঙ্গে। কিন্তু তিনি কবিদের ছেড়ে একজন গদ্যকারের সঙ্গে কেন আড্ডা দিতে আসেন, তা তিনিই জানেন। দৈনিক বাংলার জন্যে লেখা দরকার, এই কারণেই কি তাঁর আমার পাশে বসে থাকা? আমার স্তাবকতা করার জন্যে দৈনিক বাংলা তাঁকে বেতন দিচ্ছে না।

আমি আমার নিজের নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্যে এঁদের আটকে রাখি। পত্রিকার কাজের দোহাই দিয়ে হাসান হাফিজ উঠতে যান — আমি তাঁর শার্ট খামচে ধরে বলি — অসম্ভব যেতে পারবেন না। থাকতে হবে।

হাসান হাফিজ রুখে গিয়ে বলেন— আপনার না হয় চাকরি বাকরির ব্যাপার নেই। অটোগ্রাফ দিতে পারলেই হল। কিন্তু আমি তো চাকরি করি।

অসম্ভব। আপনাকে কিছুতেই যেতে দেয়া হবে না।

হতাশ হয়ে তিনি বসে পড়েন।

শুরু হয় গল্প। সেই গল্পে আর যাই থাকুক হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য থাকে না। এরা আমার অতি প্রিয়জন। নিজের অপমান আমি সহ্য করতে পারি, বন্ধুদের অপমান কখনোই না।

প্রকাশকদের কথা বলা হচ্ছে — হ্যাঁ আমাকে দিয়ে তাঁদের কিছু স্বার্থ সিদ্ধি তো

হবেই। কিন্তু একটা ব্যাপার ভুললে চলবে না। এঁরা আমার উপর যতটা নির্ভরশীল — আমি তাঁদের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। আমার লেখা এদেশের প্রতিটি আনাচে কানাচে পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁরাই। আজকের এই বইমেলার বিশাল আয়োজনের নেপথ্য নায়ক এঁরাই। পাঁচ বছর আগের বইমেলার সর্বাধিক বিক্রিত একটি গ্রন্থের বিক্রয় সংখ্যা ছিল সাত শ'। আজ একজন নবীন লেখকের লেখাও মেলার প্রথম দশদিনে এক হাজার কপির বেশি বিক্রি হয়।

মানুষকে গ্রন্থের প্রতি আগ্রহী করার প্রধান ভূমিকা এই প্রকাশকদের। এঁরা ব্যবসায়ী। একজন ব্যবসায়ী লাভ–লোকসান দেখবেন। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, এরা লাভ–লোকসান বিবেচনা করে চিনি বা পেঁয়াজের ব্যবসায় যাননি। এসেছেন বই–এর ব্যবসায়, যার কোন স্থিরতা নেই। এঁদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে পাশের দেশের শক্তিমান প্রকাশকদের সঙ্গে। যাদের আছে দীর্ঘদিনের প্রকাশনার অভিজ্ঞতা।

আমার বই–এর যাঁরা প্রকাশক তাঁরা সবাই অল্পবয়স্ক। কারো বয়সই আমার চেয়ে বেশি নয়। প্রতিষ্ঠিত পুরানো প্রকাশকরা আমার প্রতি আগ্রহী হননি। আগ্রহী হয়েছেন তরুণ-প্রকাশকরা — আজ আমাদের প্রকাশনা শিল্পের যে জয়জয়কার তা তাঁদের উদ্যম এবং কর্মপ্রচেষ্টার সোনালী ফসল।

কলকাতার প্রকাশকরা সেখানে আমার নয়টি বই প্রকাশ করেছেন। মনিলিথো কাগজ নামে চমৎকার কাগজ ব্যবহার করেছেন। তারপরেও সেসব বই এবং এদেশে প্রকাশিত আমার বইগুলি যখন পাশাপাশি রাখি তখন কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই বলতে বাধ্য হই — আমাদের দেশে প্রকাশিত বইগুলির প্রকাশনা মান অনেক অনেক উপরে।

আমরা যাত্রা শুরু করেছি — এই যাত্রা দীর্ঘ যাত্রা। পথ তৈরি নেই। বন কেটে পথ বানাতে হচ্ছে। বানাচ্ছেন এই সময়ের তরুণ প্রকাশকরা। তাঁদের মুর্খ বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চাইলে করা যেতে পারে। কিন্তু এই মূর্খ(!)রাই চেষ্টা করে যাচ্ছেন যেন দেশ থেকে 'মূর্খ' শব্দটি উঠে যায়।

আমার বন্ধু এঁরাই। মহা আঁতেল বিজ্ঞ পণ্ডিতরা নন। আমার লেখা ছেপে ওঁরা যে অপরাধ করেছেন — বিজ্ঞ পণ্ডিতদের লেখা ছেপে সেই অপরাধ তাঁরা কাটান দেবার চেষ্টাও করছেন। অন্তত এই ধন্যবাদটুকু তো তাঁদের প্রাপ্য।

ছুনু মিয়া

'আমার নাম ছুনু মিয়া।' গলার স্বরে বিস্মিত হয়ে তাকালাম। চাপা হিসহিসে গলা। সর্পকুলের কথা বলার ক্ষমতা থাকলে হয়ত এভাবেই কথা বলত। তবে আমার পাশে যে দাঁড়িয়ে সে সাপ না, মানুষ। ছোটখাট একজন মানুষ। গায়ে চকচকে শার্ট। সেই শার্ট প্যান্টের ভেতর ইন করা। পায়ে অবশ্যি স্পঞ্জের স্যান্ডেল। লক্ষ্য করলাম, পায়ের বুড়ো আঙুলে নেল পলিশ দেয়া হয়েছে। হাতের কনিষ্ঠ আঙুলেও নেল পলিশ। মাথার চুল তেলে চপচপ করছে। চোখে সানগ্লাস। কিছুক্ষণ আগে পান খেয়েছে, পানের রস গড়িয়ে পড়ছে।

'আমার জন্যে এটু খাস দিলে দোয়া রাখবেন স্যার।'

এই বলে ছুনু মিয়া আমাকে কদমবুসি করতে এগিয়ে এল। আমার পাশের চেয়ারে নীলগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গনি সাহেব বসে আছেন।' তিনিও ছুনু মিয়ার মতই ছোটখাট মানুষ। তবে গলায় অসম্ভব জোর। তিনি প্রচণ্ড ধমক লাগালেন, খবর্দার, উনার গায়ে হাত দিবি না। খবর্দার বললাম।

ছুনু মিয়া হেসে ফেলল। মনে হল ধমক খেয়ে সে বড়ই আনন্দ পাচ্ছে। গনি সাহেব আবারো ধমক দিলেন, দূরে গিয়া দাঁড়া ছুনু।

ছুনু একটু সরে গিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসল। ধমক খেয়ে এত আনন্দিত হতে এর আগে কাউকে দেখিনি। সে পকেটে হাত দিয়ে রুমাল বের করে বেশ কায়দা করে মুখ মুছতে লাগল। ফুল তোলা বাহারী রুমাল। রুমালে আতর ছিল বোধহয়। চারদিক সস্তা আতরের গন্ধে ভরে গেছে।

গনি সাহেব বললেন, ছুনু, তুই দশ হাত দূরে গিয়া বস। চশমার ফাঁক দিয়া উনারে দেখবার চেষ্টা করবি না। চশমার ফাঁক দিয়া দেখনের চেষ্টা করছস কি তোরে জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলব। উনি 'অতিথ' মানুষ। উনার বিপদ হইলে তোর রক্ষা নাই।

আমি এদের আচার–আচরণ, কথাবার্তা কিছুই বুঝলাম না। তবে খুব ব্যস্তও হলাম না। আমি জানি, যথাসময়ে আমাকে বলা হবে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই ছুনুকে আনা হয়েছে। এখন তাকে নিয়ে খানিকটা নাটক করা হচ্ছে। গ্রামের লোকজন নাটক করতে পছন্দ করে।

গনি সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, ছুনু মিয়ার চোখ খুবই খারাপ। চোখে নজর লাগে। তার চোখের নজর এই অঞ্চলে বিখ্যাত। এই জন্যেই কালো চশমা। ইউনিয়ন বোর্ডের খরচে চশমা কিনে দেয়া হয়েছে। তবে হারামজাদা বদের হাড্ডি। চশমার ফাঁক দিয়া দেখার চেষ্টা করে। এইটু আগে আপনেরে দেখার চেষ্টা করতেছিল। সময়মত বুঝতে পারছি বইল্যা রক্ষা।

নজর লাগা ব্যাপারটা আমার অজানা নয়। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটাতে এরা এমন বিশিষ্টতা আরোপ করবে, ইউনিয়ন বোর্ডের পয়সায় নজর লাগা ঠেকানোর জন্যে সানগ্লাস কিনে দেয়া হবে তা ভাবিনি। সানগ্লাস পরিয়ে নজর লাগা ঠেকানো যায় তাও জানা ছিল না।

যার নজর লাগে বলে সবাই মনে করে সে এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগবে এটাই স্বাভাবিক। ছুনু মিয়ার মধ্যে সেরকম কিছু দেখা গেল না, বরং তাক তার ক্ষমতায় বেশ আনন্দিত মনে হল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পর রুমালে মুখ মুছছে।

গনি সাহেব বললেন, এই ছুনু, স্থির হইয়া বস। অত কিসের নড়াচড়া?

ছুনু মিয়া আবারো দাঁত বের করে হাসল। সবাই তার দিকে লক্ষ্য রাখছে এটাই মনে হয় তার আনন্দের মূল কারণ। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, ছুনু নামের অর্থ কি?

ছুনু মিয়া হাসি মুখে বলল, নামের অর্থ জানি না। পিতা-মাতা নাম রাখছিল ছানোয়ার. গেরামের লোকে ডাকে ছুনু। বড় নামে ডাকতে গেরামের লোকের কষ্ট হয়। গেরামের লোকের জিহ্বা থাকে মোটা।

আমি ছুনু মিয়ার রসিকতায় অবাক হলাম। তারচেয়েও অবাক হলাম তার গলার স্বরে। আগে যেমন সাপের গলায় কথা বলছিল এখন তা বলছে না। স্বাভাবিক গলা। মনে হয় প্রথম পরিচয়ের সময় সাপের মত গলা সে ইচ্ছা করেই করে। শুরুতেই ভয় দেখানোর চেষ্টা। আমি বললাম, তোমার বয়স কত ছুনু?

ছুনু কিছু বলার আগে চেয়ারম্যান সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, স্যার, আপনে এরে তুমি কইরা বলতেছেন কেন? তুমি বলনে লাই পাইতেছে। এরে তুই কইরা বলেন।

ছুনু উদাস গলায় বলল, তুইয়ের নিচে কিছু থাকলে হেইডাও বলতে পারেন। অসুবিধা কিছু নাই। বয়স জিগাইছেন, বয়স ভালই হইছে। অধিক বয়সে বিবাহ করছি বইলা পোলাপান ছোট ছোট। বড় মাইয়া কেলাস সিক্সে পড়ে। আপনাদের দশজনের দোয়ায় সরকারি বৃত্তি পাইছে।

আমি বিস্মিত হয়ে গনি সাহেবের দিকে তাকালাম। গনি সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, কথা সত্য। এই হারামজাদার ছেলেমেয়ে প্রত্যেকটা লেখাপড়ায় ভাল। বড় মেয়েটা তো অত্যধিক ভাল। ময়মনসিং ডিসট্রিক্টে সেকেন্ড হয়েছে।

বলেন কি?

গনি সাহেব উদাস গলায় বললেন, গোবরে পদ্মফুল যে বলে এই জিনিস, আর কিছু না। গোবর তো না, একেবারে গুয়ের মধ্যে পদ্মফুল।

ছুনু বলল, বেয়াদবী না নিলে একটা সিগারেট দেন স্যার। খাইয়া দেখি। বিড়ি টানতে টানতে কইলজার কাম শেষ।

আমি প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করলাম। গনি সাহেব হা হা করে উঠলেন,

হাতে দিবেন না স্যার। হাতে দিবেন না। মাটিতে ফিক্যা মারেন, বলে তিনি অপেক্ষা করলেন না। আমার হাত থেকে সিগারেট নিয়ে নিজেই ছুনুর দিকে ছুঁড়ে দিলেন। ছুনু সেই সিগারেট শূন্য থেকে লুফে নিল।

গনি সাহেব বললেন, এই হারামজাদার কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। হারামজাদার চোখ শয়তানের চোখের চেয়েও খারাপ।

আমি বললাম, কি রকম খারাপ?

গনি সাহেব অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ধরেন একটা লকলকা লাউ গাছ, ছুনু যদি সেই গাছ দেখে বলে, আহা কি সুন্দর, তা হইলেই কাম সারা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গাছের মৃত্যু।

ছুনু আপত্তির গলায় বলল, কিছু না বললেও হয়, বলা লাগে না।

আমি সন্দেহের গলায় বললাম, এটা কি পরীক্ষিত?

আমার সন্দেহে গনি সাহেব আহত হলেন। ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, অবশ্যই পরীক্ষিত। গাছপালা, গরু-ছাগল, মানুষ সবেতেই তার চোখ লাগে।

ছুনু উদাস গলায় বলল, কলকব্জার মধ্যেও লাগে। গনি চাচা, বজলু ভাইয়ের সাইকেলের গফটা স্যাররে বলেন। স্যার মজা পাইব।

বজলুর সাইকেলের গল্প শুনলাম। বজলু স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক, নতুন সাইকেল কিনেছে। প্রিন্স সাইকেল। অনেকের সঙ্গে ছুনুও সাইকেল দেখতে গেল এবং ফস করে মনের ভুলে বলে বসল, জবর সাইকেল খরিদ করছেন বজলু ভাই। এমুন সাইকেল লাখে এক।

এই বলাই কাল হল। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের চাকা বার্স্ট। শব্দ হয়েছিল দু'নলা বন্দুকের গুলির মত।

গল্প শুনে বিস্মিত হবার ভঙ্গি করব কি না বুঝতে পারছি না। আমি বিস্মিত হলে গনি সাহেব খুশি হন। তিনি গত তিনদিন ধরে আমাকে নানানভাবে বিস্মিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। গতকাল এক গায়ক নিয়ে এসেছিলেন, যার গলা নাকি অবিকল হেমন্তের মত — কোন উনিশ-বিশ নেই। গায়কের গলা আসলেই ভাল। তবু গণ্ডগ্রামের লুঙ্গি পরা খালি গায়ের গায়কের গলায় 'তুমি এলে অনেক দিনের পরে যেন "বিস্তি" এল' শুনতে ভাল লাগে না। ঝাড়া দু'ঘণ্টা হেমন্তের গান শুনলাম। গায়কের ধৈর্য যেমন অসীম, মুখস্থ গানের সংখ্যাও অসীম। গান শুনে আমি ক্লান্ত ও বিরক্ত। তারপরেও বিস্মিত, অভিভূত হবার ভঙ্গি করে বলতে হল, অদ্ভুত। এরকম শুনিনি। গনি সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বড়ই আফসোস! কত বড় বড় প্রতিভা পল্লীগ্রামে নষ্ট হইতেছে।

কে জানে ছুনু মিয়াও হয়তো এদের চোখে বিরাট প্রতিভা। 'পল্লীগ্রামে' অনাদরে নষ্ট হচ্ছে। আমাকে দেখিয়ে সেই প্রতিভার খানিক স্বীকৃতিও যদি পাওয়া যায়! গনি সাহেব আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললেন, ভাই সাহেব, ছুনুর চোখ বড়ই

ডেঞ্জারাস। ভেরী ভেরী ডেঞ্জারাস।

গ্রামের মানুষদের এই আরেক অভ্যাস, কানে কথা বলা। ছুনুর চোখ ডেঞ্জারাস এই তথ্য আমার কানের ভেতরে দিয়ে দেয়ার দরকার নেই। এটা তেমন গোপন তথ্যও না। এমন না যে ছুনু এই গোপন সংবাদ দিয়ে দেয়ায় আহত হবে। ছুনু এই খবরে খুশি হয় বলেই আমার ধারণা। সে যে একজন ডেঞ্জারাস ব্যক্তি তা প্রমাণ করার জন্যে ছুনুর নিজের ব্যস্ততাও কম না। গনি সাহেবের চেয়ে বেশি বলেই তো মনে হচ্ছে।

ছুনু বলল, বিয়া বাড়ির গফটা করেন, স্যার মজা পাইব। বড়ই মজার গফ।

মজা পাবার জন্যে আমি তেমন অস্থির ছিলাম না। তারপরেও বিয়ে বাড়ির গল্প শুনতে হল। তিন বছর আগের ঘটনা। এই গ্রামেরই এক মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। বর আসছে পাল্কিতে। পথে ছুনুর সঙ্গে দেখা। ছুনু পাল্কি দেখে মুগ্ধ হয়ে (মনের ভুলে) বলে ফেলল, মেলা দিন পরে পাল্কি দেখলাম। বড়ই সৌন্দর্য! ছুনুর কথা শেষ হবার আগেই পাল্কি ভেঙে ধান ক্ষেতে পড়ে গেল। সেখানে আবার এক হাঁটু পানি। নতুন বর কাদায়-পানিতে মাখামাখি। কনেবাড়ির লোকজন খবর শুনে ছুনুকে ধরে ইচ্ছামত ধোলাই দিয়েছে। নীলগঞ্জ সদর হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল চারদিন।

ছুনু হাসিমুখে বলল, আরেকটু হইলে জানে মাইরা ফেলত স্যার। অল্পের জন্যে জেবন রক্ষা হইছে। সবই আল্লার ইশারা।

আমি বললাম, মার খেয়ে তুমি তো মনে হয় খুশিই হয়েছ।

ছুনু বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, মাইর তো স্যার খাওন লাগবই। অতবড় একটা ক্ষমতা।

'এই ক্ষমতায় কি তুমি খুশি?'

'লোকজন আমারে সমীহ করে। যখন পথে হাঁটি আঙুল উচাইয়া দেখায় — বড় ভাল লাগে! এই যে আফনে আমারে আদর কইরা ফিলটার ছিগ্রেট দিলেন, আমি খাইলাম, এই গুলান হইল আমার ক্ষমতার কারণে। ক্ষমতা না থাকলে কে আমারে পুছতো?'

'তুমি কি নিশ্চিত তোমার ক্ষমতা আছে?'

ছুনু মিয়া প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলল। আনন্দিত গলায় বলল, নিজের কথা নিজের মুখে বলা ঠিক না, গুনাহ হয়। আল্লাহপাক বেজার হন। দশ জনেরে জিজ্ঞেস করেন, তারা বলব। আর যদি অনুমতি দেন তা হইলে চোউক্ষের একটা খেলা দেখাইয়া দিমু।

চোখের খেলা দেখার জন্যে আমি তেমন আগ্রহ দেখালাম না। এই সব আধিভৌতিক ব্যাপারকে প্রশ্রয় যত কম দেয়া যায় ততই ভাল। পিশাচ ও ডাইনীদের যুগ পেছনে ফেলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। চাঁদে মানুষ পৌঁছে গেছে, কিছুদিন পর পৌঁছবে মঙ্গল গ্রহে। এই সময় চোখ লাগা নিয়ে মাথা ঘামানো শুধু হাস্যকর না, অপরাধও।

পরদিন দুপুরে ছুনুর সঙ্গে আমার আবার দেখা। গনি সাহেবকে নিয়ে বেড়াতে বের

হয়েছি। হঠাৎ দেখি, খালের পাড় থেকে ছুনু কচুর লতি সংগ্রহ করছে। ছুনুর গায়ে আগের দিনের পোশাক নেই। ময়লা লুঙ্গি, খালি গা। চোখে সানগ্লাসও নেই। ছুনুর সঙ্গে বার-তের বছরের ফুটফুটে একটা মেয়ে। ছুনুর তুলনায় তার মেয়েটার পোশাক পরিপাটি। ফ্রকটা সুন্দর এবং পরিষ্কার। মাথার চুল বেণী করে বাঁধা। এই বোধহয় ছুনুর বৃত্তি পাওয়া মেয়ে। আমি বললাম, কে, ছুনু না?

ছুনু জিবে কামড় দিল, যেন হঠাৎ আমাকে দেখে লজ্জা পেয়েছে।

'এই কি তোমার বৃত্তি পাওয়া মেয়ে?'

ছুনু যেন আরো লজ্জা পেল। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, নাম কি মা?

মেয়ে বিস্মিত এবং খুশি খুশি গলায় বলল, মরিয়ম।

ছুনু বলল, চাচাজানরে কদমবুসি কর মা। মুরুব্বিরে আদব করবা না এইসব আমি সহ্য করব না। মেয়ে এসে সালাম করল। আমি অবাক হয়ে দেখি, ছুনু চোখ মুছছে। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ছুনু বলল, আপনের মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার মেয়েরে মা ডাকল, মনটার মধ্যে বড় আনন্দ হইতেছে স্যার। বড় আনন্দ। আপনার মত মানুষের দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা।

গনি সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, ঢং করিস না ছুনু। আজ তোর চশমা কই? চশমা ছাড়া ঘুরতাছস, তুই পাইছস কি?

গনি সাহেবের কথায় তার ভাবান্তর হল না। সে চোখ মুছতেই থাকল।

সন্ধ্যাবেলা গনি সাহেবের বাড়িতে ফেরার পথে ছোট্ট দুর্ঘটনা ঘটল। পা পিছলে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক থেকে নিচের খালে পড়ে গেলাম। ব্যথা ভালই পেলাম। পা মচকে গেল। দেখতে দেখতে ফুলে ঢোল। গনি সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, এই রকম ঘটনা যে ঘটব আগেই টের পাইছি। ছুনু যখন বলছে, আপনার মত মানুষের দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা তখনই বুঝছি, হইছে কাম।

আমি বললাম, গনি সাহেব, আমি নিজের কারণে ব্যথা পেয়েছি। পা পিছলে পড়ে গেছি। বেচারা ছুনুকে এর মধ্যে জড়ানো খুবই হাস্যকর হচ্ছে।

গনি সাহেব থতমত গলায় বললেন, শুকনা খটখটা রাস্তা, এর মধ্যে আপনের পা পিছলাইল, বিষয় কি? বিষয় পরিষ্কার। ছুনু হারামজাদা নজর দিছে। তার চউখে ছিল না চশমা। এটা তো সোজা হিসাব। হারামজাদার সাহস কত! চশমা ছাড়া ঘুরে। এর মীমাংসা হওয়া দরকার।

অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে তর্ক চলে না। কাজেই আর কিছু না বলে আমি গনি সাহেবের কাঁধে ভর দিয়ে ঘরে ফিরলাম। আমার উপর ছুনু নজর দিয়েছে এই খবর কিছুক্ষণের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল। দলে দলে লোক আমাকে দেখতে আসতে লাগল। যেই আসে, গনি সাহেব তার কাছেই নজর লাগার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন। আমাকে আমার ফুলে যাওয়া পা দেখাতে হয়। দর্শনার্থীরা "আহা, বিদেশী মানুষটারে কি বিপদে ফেলছে" বলে

সমবেদনার আর্দ্র স্বর বের করে। বিশ্রী অবস্থা!

রাতে খাবার সময় গনি সাহেব আমাকে জানালেন যে, ছুনুকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে পলাতক। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ছুনু পলাতক কেন?

তার নজর লাগছে সেই খবর পাইয়া ভাগছে। ভাইগ্যা যাইব কই? ছুনুর কপালে দুঃখু আছে। বেজায় দুঃখু।

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, মারধোর করা হবে নাকি?

'দেখেন না কি হয়। আইজ তার বাপের নাম বিস্মরণ হবে।'

'আমি আপনার কাছে হাত জোড় করে বলছি ছুনুকে কিছুই বলবেন না। আমি পুরো ব্যাপারটায় খুবই লজ্জিত। আমার লজ্জা আর বাড়াবেন না।'

গনি সাহেব উত্তর দিলেন না। গম্ভীর হয়ে রইলেন।

গ্রামের মানুষ একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে তার প্রমাণ পেলাম শেষ রাতে। ঘুমিয়ে ছিলাম। গনি সাহেব আমাকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, ছুনু ধরা পড়েছে। আসেন দেখে যান। হারামজাদা কত বড় বদ! নিজের ঘরের চালের উপরে উঠে বসেছিল। তয় তার জন্মের শিক্ষা হয়ে গেছে।

আমি ঘর থেকে বের হয়ে দেখি, উঠোনের মাঝখামে ছুনু পড়ে আছে। আমাকে আসতে দেখে কে একজন পাঁচ ব্যাটারির একটা টর্চ ছুনুর উপর ধরল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ছুনুর গায়ে কোন কাপড় নেই, সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সে পড়ে আছে। সারা শরীর রক্তে মাখামাখি। সে মাঝে মাঝে শাঁ শাঁ জাতীয় শব্দ করছে। আবার সেই শব্দ থেমে যাচ্ছে। কি ভয়াবহ অবস্থা!

উঠোনের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ছুনুর মেয়েটা। সে তার বাবাকে দেখছে না, দেখছে আমাকে। তার চোখে ঘৃণা নেই, রাগ নেই, তার চোখ গভীর অভিমানে আর্দ্র।

আমি ছুনুর কাছে গিয়ে বললাম. ছুনু, আমার লজ্জা আর অনুতাপের কোন শেষ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

ছুনু অনেক কষ্টে চোখ মেলল। আমি তার চোখে-মুখে একটা আনন্দের আভা দেখলাম। সে ফিস ফিস করে বলল, গরীব হইয়া জন্মাইছি। মাইর তো কপালে আছেই। স্যাররে যে ক্ষমতাটা দেখাইতে পারছি এইটাই মনে শান্তি। আপনে জ্ঞানী মানুষ। আপনে যেটা বুঝবেন, অন্য দশজনে সেইটা বুঝব না। তাছাড়া আইজের ঘটনায় নাম আরো ফাটব। এইটাও তো স্যার কম কথা না। মন্দ হউক ভাল হউক, একটা ক্ষমতা পাইছি। দশজনে যদি নাই জানলো, হেই ক্ষমতা দিয়া লাভ কি? আমারে একটা সার্টিফিকেট যদি লেইখ্যা দেন বড় ভাল হয়। ঘরে টানাইয়া রাখি।

'কি সার্টিফিকেট?'

'নজরের বিষয়ে একটা সার্টিফিকেট।'

'আচ্ছা যাও, দেব সার্টিফিকেট।'

ছুনুর হেঁচকির মত উঠছে। দূরে দাঁড়িয়ে তার মেয়েটা কাঁদছে। কি অদ্ভুত

পরিস্থিতি! কে একজন বলল, ছুনুর তওবাটা পড়ায়ে ফেলা দরকার, অবস্থা ভাল ঠেকতেছে না।

ছুনুকে বিছানায় এনে শোয়ানোর ব্যবস্থা করে ডাক্তার আনতে লোক পাঠালাম। ছুনু চোখের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকল। আমি মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ফিস ফিস করে বলল, মইরা যাব কিনা বুঝতাছি না। শ্বাসকষ্ট হইতাছে। একটা গোপন কথা আফনেরে বইল্যা যাই স্যার। না বললে 'অফরাধি' হইয়া থাকব। আমার আসলে কোন ক্ষমতা নাই। দুষ্ট লোকে গেরাম ভর্তি। ক্ষমতা থাকলে নজর দিয়া এরারে শেষ কইরা দিতাম। যেমন ধরেন, আমরার চেয়ারম্যান গনি সাহেব। কত চেষ্টা করছি তারে নজর লাগাইতে। লাগে না।

আমি তাকিয়ে আছি। কি বলব বুঝতে পারছি না।

ছুনু শ্বাস টানতে টানতে ফিসফিস করে বলল, সার্টিফিকেটটা কিন্তু স্যার দিবেন। বাঁইচ্যা থাকলে কামে লাগব।

আঙুল

আগুনের পরশমণি ছবি করার সময়কার কথা — একটা দৃশ্য আছে মিলিটারী একজন মুক্তিযোদ্ধার আঙুল কেটে ফেলে। আমি ভাবলাম — এমন একজন কাউকে যদি পাওয়া যেত যার হাতের দু'টি আঙুল কাটা পড়েছে তাহলে খুব ভাল হত। সরাসরি তার হাতটা ক্যামেরায় দেখানো যেত।

ফিল্ম লাইনের প্রডাকশানে সাইডে যারা কাজ করেন তাঁরা পারেন না হেন ব্যাপার নেই। আমি আঙুল কাটা পড়েছে এমন একজনকে খুঁজছি শুনে তাঁরা বললেন, স্যার, আপনি নিশ্চিত থাকুন। এক সপ্তাহের ভেতর আপনি লোক পাবেন।

ওদের কথা আমি বিশ্বাস করিনি। দৃশ্যটা অন্যভাবে লেখার পরিকল্পনা করে ফেললাম। তখন সত্যি সত্যি লেদ মেশিনে আঙুল করার কাটা পড়েছে এমন একজন তারা উপস্থিত করল। লোকটিকে আমি ব্যবহার করিনি তবে তার কাটা আঙুলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথার ভেতর একটা গল্প তৈরি হয়ে গেল। গল্পটি দেশের কোন পত্রিকায় ছাপা হয়নি — কোলকাতার একটি শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে গল্পটি দিয়ে দিচ্ছি। গল্প কিভাবে তৈরি হয় অনেকে জানতে চান। গল্প তৈরির অনেক প্রক্রিয়ার একটি বলা হল —

'দেখি হাত দেখি।'

এক হাত মেললেই হয় — মোবারক দু'হাত মেলে ধরল। মোবারকের কেমন ভয় ভয় করছে। মনে হচ্ছে ডাক্তারকে হাত দেখাচ্ছে। বামুনদের মত বেঁটে যে ভদ্রলোক হাত দেখছেন — তিনি কোন ডাক্তার না। ফিল্মের ডাইরেক্টার। ফিল্মের নাম "শেষ প্রতিশোধ"।

মোবারক লক্ষ্য করল উত্তেজনায় তার হাতের আঙুল কাঁপছে। দশটা আঙুল কাঁপার কথা, তার কাঁপছে সাতটা। কারণ ডান হাতের পাঁচটা আঙুলের মধ্যে তিনটা তার নেই, লেদ মেশিনে কাটা পড়েছে। মেশিনে কাটা বলেই সুন্দর করে কাটা। দেখতে খুব খারাপ লাগে না।

ডাইরেক্টার সাহেব আগ্রহ নিয়ে কাটা আঙুল দেখছেন। তাঁর পছন্দ হচ্ছে কিনা মোবারক বুঝতে পারছে না। ভদ্রলোকের ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হয় খুঁতখুঁতে স্বভাবের। বেঁটে লোক খুঁতখুঁতে স্বভাবের হয়।

'আপনার নাম কি বললেন যেন?'

'স্যার, আমার নাম মোবারক।'

'আমরা আসলে চেয়েছিলাম চারটা আঙুল কেটেছে এমন লোক। এক হাতে শুধু একটাই আঙুলের অন্য এক ধরনের বিউটি আছে। যাই হোক, আপনাকে দিয়েও চলবে। অভিনয় করেছেন কখনো?'

'জ্বি না স্যার।'

'অভিনয় না করলেই ভাল। যা বলব ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে তাই করবেন। পারবেন না?'

'জ্বি স্যার পারব।'

'গুড। খুব সহজ দৃশ্য। এক অত্যাচারী লোক তোমাকে ধরেছে। সে ছড়তা দিয়ে কচ কচ করে তোমার হাতের তিনটা আঙুল কেটে ফেলবে। এক একবার কাটবে আর তুমি 'আঁ' বলে এক চিৎকার দিবে।'

মোবারকের কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। ডাইরেক্টার সাহেব একটু আগে তাকে আপনি করে বলছিলেন, এখন তুমি বলছেন। শুরু থেকে তুমি করে বললে অস্বস্তি লাগত না। প্রথম কিছুক্ষণ আপনি বলায় লাগছে। ছড়তা দিয়ে আঙুল কাটার ব্যাপারটাও সে বুঝতে পারছে না। আঙুল তো কাটাই আছে, আবার নতুন করে কাটবে কি?

'তোমার বুকে লোম আছে?'

মোবারক লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, জ্বি না স্যার।

ডাইরেক্টার সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, পুরুষের বুকে লোম আজকাল উঠেই গেছে। কারণটা বুঝলাম না। যাই হোক, তুমি শার্টটা খুলে ফেল। খালি গায়েই ভাল লাগবে। খোল, শার্ট খোল।

এত লোকের মাঝখানে শার্ট খুলতে মোবারকের লজ্জা লাগছে। সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে, যেন পুরুষ মানুষের উদোম হওয়ার দৃশ্য তারা আগে দেখেনি। এদের মধ্যে মেয়েছেলেও আছে। একটা মেয়ে তো একেবারে লাল টুকটুক, গদি দেয়া চেয়ারে বসে আছে। নায়িকা-টায়িকা হবে। নায়িকা না হলেও নায়িকার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী কিংবা ছোট বোন। মেয়েটা একটু পরপর বিশ্রী ভঙ্গিতে হাই তুলছে। তার মুখটা ছোট তবে হা করার সময় বিশাল হয়ে যাচ্ছে, জিভ দেখা যাচ্ছে। কালো রঙের একটা জিভ। মোবারকের মনে হল, মেয়েটার জিভটা রঙ করে দেবার দরকার ছিল। লাল টুকটুক চেহারার সঙ্গে কাল জিভ মিশ খাচ্ছে না।

ডাইরেক্টার সাহেব বললেন, তোমার নাম যেন কি বললে?

'স্যার মোবারক।'

'শোন মোবারক, তুমি চুপ করে বসে থাক। তোমার শট কখন নেব বুঝতে পারছি না। প্রডাকশনের কেউ আছে? মোবারককে চা-বিসকুট দে।'

মোবারক লজ্জিত মুখে বসে আছে। সামান্য কয়টা টাকার জন্যে এই ঝামেলায় আসাটা ঠিক হয়েছে কি না, বুঝতে পারছে না। মোবারক শুধু যে নিজে লজ্জা পাচ্ছে তা না, তার ধারণা তার ডান হাতটাও লজ্জার মধ্যে পড়েছে। আগে যেখানে আঙুল ছিল সেই জায়গা চুলকাচ্ছে। আঙুল নেই অথচ চুলকাচ্ছে — যাকে বলে ভৌতিক অবস্থা। এরকম তার মাঝে মাঝে হয়। লজ্জা বা অস্বস্তির মধ্যে পড়লে বেশি হয়। বললে কেউ

বিশ্বাস করবে না বলে মোবারক ব্যাপারটা কাউকে বলেনি, শুধু লতিফাকে বলেছে।

লতিফা গম্ভীর গলায় বলেছে, চুলকালে কি করেন? চুলকান?

'হুঁ।'

'আঙুল তো নাই। কই চুলকান?'

'বাতাসের মধ্যে চুলকাই। এতে আরাম হয়।'

লতিফা, মোবারকের ছোট ভাই আবদুল করিমের স্ত্রী। দেড় বছর হল বিয়ে হয়েছে। এখনো ছেলেপুলে হয়নি বলে স্বভাব-চরিত্র নতুন বৌয়ের মত। লাল শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে ঘুরঘুর করে, দেখতে ভাল লাগে। নতুন বৌ হল বাড়ির শোভা। মোবারকের প্রায়ই মনে হয়, প্রতিটি বাড়িতে একটা করে নতুন বৌ থাকা দরকার। সেজে-গুজে থাকবে, নতুন শাড়ি পরে ঘুরঘুর করবে।

মোবারকের এই মেয়েটাকে বড়ই পছন্দ। মেয়েটার সবই ভাল, শুধু হাসি-রোগ আছে। সব কিছুতেই হাসি। মোবারক হল তার ভাসুর। ভাসুরের সামনে হাসা খুব বড় ধরনের বেয়াদবি। এই মেয়ে সেটা জানে, জেনেও হাসে। তবে এই অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সব ভাল জিনিসে খুঁত থাকে। সোনায় থাকে গিল্টি, চন্দ্রে কলঙ্ক। কি আর করা! এই যে পরীর মত সুন্দর একটা মেয়ে তার কাছেই চেয়ারে বসে আছে, তার জিভটা তো কালো।

খালি গায়ে বসে থেকে মোবারক তার অদৃশ্য আঙুল চুলকায়। এক ঘণ্টার উপর হল সে বসে আছে। ডাইরেক্টার সাহেব চা দিতে বলেছিলেন, সেই চা তাকে এখনো কেউ দেয়নি। তবে অনেকেই চা-বিসকুট খাচ্ছে। মোবারক খুব ভাল করে চারদিক দেখার চেষ্টা করছে। বাসায় গিয়ে এক ফাঁকে লতিফাকে বলতে হবে। বেচারী ছেলেমানুষ এই সব জিনিসে মজা পাবে। অতি ভাল একটা মেয়ে। ভাসুরের সামনে দুই-একটা ছোটখাট বেয়াদবি করে ফেলে। বয়স কম বলেই করে। সব কিছু ধরলে সংসার চলে না। কিছু ধরতে হয়, কিছু ছাড়তে হয়। তাছাড়া এই জামানায় কয়টা মেয়ে তার ভাসুরকে খাতির করে? সেই ভাসুর কাজের ভাসুর হলেও একটা কথা ছিল। মোবারক হল অকাজের ভাসুর। ছোট ভাইয়ের ঘাড়ে বসে খাচ্ছে-দাচ্ছে-ঘুমাচ্ছে। তাকে খাতির করার কি আছে? এই সব ক্ষেত্রে উল্টোটা হয়। ছোট ভাইকে এবং তার স্ত্রীকে খাতির করে চলতে হয়। সব সময় খেয়াল রাখতে হয় এরা যেন বেজার না হয়। আবদুল করিমের ব্যাপারে মোবারক যে তা করে না, তাও না। করে, নিজের অজান্তেই করে। করার পর মনটা খারাপ হয়ে যায়। নিজের উপর রাগে গা জ্বলে যায়।

গত সোমবারে রহমানিয়া হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানছিল। হঠাৎ দেখে আবদুল করিম বাজার করে ফিরছে। দেখামাত্র সে হাতের সিগারেট ফেলে দিল। কি কাণ্ড! নিজের ছোট ভাই। তাকে দেখে সে সিগারেট ফেলবে কেন? ভাগ্যিস আবদুল করিম ব্যাপারটা দেখেনি। দেখলে একটা লজ্জার ব্যাপার হত।

দীর্ঘদিন চাকরি-বাকরি না থাকলে মন ছোট হয়ে যায়। তখন মানুষ ছোট ভাইকে

দেখে সিগারেট ফেলে দেয়ার মত কাণ্ড-কারখানা করে বসে। তার মন যে ছোট হয়ে গেছে এটা মোবারক জানে। কিছুটা ছোট হয়ে থেমে গেলে হত। থামছে না। যতই দিন যাচ্ছে ততই ছোট হচ্ছে। বিশ্রী ব্যাপার। আবদুল করিমকে দেখলে ইদানিং তার কেমন জানি ভয় ভয় করে। চোখের উপর চোখ পড়লে নিজের অজান্তেই চোখ নামিয়ে নেয়। অবশ্যি আবদুল করিমের কথা-বার্তার ধরনও এখন বদলে গেছে। আগে গলার স্বর চিকন ছিল, এখন মোটা হয়ে গেছে। কথা বলার সময় ভুল তালে পা নাচায়। কিছুদিন হল চোখে আবার চশমা পরেছে। মোবারকের ধারণা, এইসব হয়েছে বিয়ের কারণে। বিয়ে করলে পুরুষমানুষ বদলাবেই। তার উপর বউ যদি সুন্দর হয় তাহলে তো কথাই নেই। নতুন বিয়ে করা পুরুষদের প্রধান কাজই হল বউকে দেখানো যে সে একটা বিরাট কিছু। কাজেই যে পুরুষের গলা চিকন সে অনেক কষ্ট করে মোটা গলায় কথা বলে। আশেপাশের সবার দিকে এমন করে তাকায় যেন তারা কেউ মানুষ না, সে একাই মানুষ। শুধু মানুষ না, জ্ঞানী মানুষ।

সেদিন খাবার টেবিলে বসে আবদুল করিম জ্ঞানীদের মত কথা বলল। প্রথম কিছুক্ষণ পা নাচাল। প্রথমে ডান পা, তারপর বাঁ পা, তারপর দুটাই একসঙ্গে। পা নাচানোর পর গলা খাঁকারি দিল। গলা পরিষ্কার করে নিল। অপরিষ্কার গলায় তো আর জ্ঞানের কথা বলা যায় না। গলা পরিষ্কার হবার পর বলল, লতু, চশমাটা দেখি। আদর করে লতিফাকে লতু ডাকা। স্ত্রীকে আদর করে ডাকবে না তো কাকে ডাকবে? লতু-ফতু যা ইচ্ছা ডাকুক, কিন্তু বড় ভাইয়ের সামনে ডাকবে কেন? আদব-কায়দার একটা ব্যাপার আছে না? তাছাড়া স্ত্রীর সামনে যে ভঙ্গিতে সে কথা বলছে সেটা তো আদবের বড় খেলাফ। চশমা চোখে দিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে কথা বলা। আরে ব্যাটা, তুই কি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নাকি? তুই হলি সাবরেজিস্টার অফিসের কেরানী। চশমার ফাঁক দিয়ে তোর কথা বলার দরকার কি? আর গলা মোটা করারও-বা দরকার কি? তোর যেমন গলা তুই তেমন গলায় কথা বলবি। এরকম মোটা গলায় বেশিদিন কথা বললে তো গলায় ক্যানসার-ফ্যানসার হবে। মোবারক অবশ্যি ভাইয়ের সব কথা মাথা নিচু করে শুনল।

'ভাইজান, আর কতদিন এই ভাবে বসে বসে থাকবেন? কিছু একটা করা দরকার না?'

মোবারক বলল, হুঁ।

'তিনটা আঙুল কাটা গেছে, তার জন্যে তো আপনি অচল হয়ে পড়েননি। হাত নেই এমন মানুষও কাজ করে খাচ্ছে।'

মোবারক মনে মনে বলল, ভিক্ষা করে খাচ্ছে। তুই কি তাই চাস? তোর বড় ভাই ভিক্ষা করলে তোর মান থাকবে?

'বেঙ্গল টুলস যে আপনাকে দশ হাজার টাকা কমপেনসেশান দিবে বলেছিল, তার কি হল? সেই টাকাটা পেলেও তো একটা ব্যবসা-ট্যাবসা শুরু করতে পারতেন। ওরা

টাকাটা কবে দিবে কিছু বলেছে?'

'দিন-তারিখ কিছু বলে নাই।'

'দিবে তো? নাকি দিবে না?'

'দিবে।'

'গা ছেড়ে বসে থাকলে কি আর দিবে? ওদের তাগদা দিতে হবে। রোজ গিয়ে বসে থাকতে হবে। দিন-রাত ঘরে বসে থাকায় কোন লাভ নাই। লতু, পান দাও তো।'

লতিফা পান আনতে যাচ্ছে এই ফাঁকে মোবারক উঠে পড়ল। পান খাওয়ার সময় সে সামনে থাকতে চায় না। তখন আবদুল করিম একটা বিশ্রী ব্যাপার করে। সেই বিশ্রী ব্যাপার দেখতে খারাপ লাগে। লতিফা যখন পান এনে দেয় তখন গদগদ ভঙ্গি করে আবদুল করিম হা করে। আবদুল করিমের মুখ ছোট, কিন্তু মুখের কাটা বিরাট বড়। হা করা মুখ বড় বিশ্রী দেখায়। লতিফাকে সেই হা করা মুখে পান ঢুকিয়ে দিতে হয়। এই ব্যাপারগুলি আগে সে আড়ালে করত। ইদানিং মোবারকের সামনেই করছে। মোবারকের ধারণা, আজকাল তাকে তার ছোট ভাই মানুষ হিসেবেই গণ্য করছে না। কুকুর-বিড়াল ভাবছে। কুকুর-বিড়ালের সামনে মানুষ লজ্জা করে না। আবদুল করিমই-বা কেন করবে?

'ভাইজান, আপনি টাকাটা উদ্ধার করার চেষ্টা করেন।'

'আচ্ছা।'

'টাকাটা পেলে আমিও কিছু দিব। দু'টা মিলায়ে একটা দোকান-টোকান দেন। আপনার বয়সও তো কম হয় নাই। থিতি হয়ে ঘর সংসার করতে হবে না?'

মোবারক মনে মনে বলল, চুপ থাক হারামজাদা। বক্তৃতা দিস না। বসে বসে পান খা। পা নাচা।

পান চলে এসেছে। আবদুল করিম চোখ বন্ধ করে হা করল। লতিফা মুখে পান ঢুকিয়ে দিল। পান খেতে খেতে বলল, বুঝলেন ভাইজান, আপনার যদি মেট্রিকটাও পাশ থাকত আমাদের অফিসে একটা ব্যবস্থা করে দিতাম। অফিসে এই জুনে লোক নিচ্ছে। আমাদের সাবরেজিস্ট্রার সাহেব বলতে গেলে আমার কথায় উঠেন বসেন। মুন্সিগঞ্জ বাড়ি। অতি অমায়িক।

মোবারক বুঝতে পারে সবই বউকে শোনানোর জন্যে চাল দেয়া কথা। কতবড় লায়েক হয়ে গেছে! মুখের কথায় চাকরি হয়ে যায়! সাবরেজিস্ট্রার তার কথায় উঠে বসে। সাব রেজিস্ট্রারের তো খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। কেরানীর কথায় উঠ-বোস করাই একমাত্র কাজ। তুই হলি ড্রিল মাস্টার, তোর কথায় উঠ-বোস করবে? ফাজিলের ফাজিল।

'ভাইজান, আপনি বেঙ্গল টুলসকে চাপ দিয়ে ধরবেন। কমপেনসেশান দেবে না মানে? তার বাপ দেবে। তেমন ঝামেলা করলে আমার লোক আছে, মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে। শুধু তক্তা না, প্রয়োজনে তক্তায় বার্নিশ দিয়ে দেবে। হা হা হা।'

এটা হল আবদুল করিমের রসিকতা। বিয়ের পর সে আবার রসিকও হয়েছে। রসিকতা করে নিজেই হা হা হি হি করে হাসে। তার মান রক্ষার জন্যে লতিফাকেও হাসতে হয়। মায়া লাগে মেয়েটার জন্যে। তক্তায় বার্নিশ দিয়ে দেবে এটা কি কোন হাসির কথা? এই কথা শুনে বেকুব ছাড়া কেউ হাসবে? অথচ মেয়েটাকে হাসতে হচ্ছে।

আবদুল করিম আবার হা করল। আরেকটা পান খাবে। এই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখাও শাস্তির মত। মোবারক চলে যেতে ধরেছে, আবদুল করিম বলল, ভাইজান, একটা কাজ করেন। আমাকে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দেন। সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। লতু, টাকা এনে দাও। পঞ্চাশ টাকার একটা নোট দাও। ফাইভ ফাইভ আনবেন।

মোবারক জানে, সংসারে কাঁচা পয়সা আসতে শুরু করেছে। কেরানী ফাইভ ফাইভ সিগারেট খায় না। আবদুল করিম ইদানিং খাচ্ছে একটা ক্যাসেট প্লেয়ারও কেনা হয়েছে। নীল কাপড়ের ঢাকনি দিয়ে সেটা ঢাকা থাকে। অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে সেই ক্যাসেট প্লেয়ার বেজে উঠে। কয়েকদিন আগে রাত তিনটার সময় ক্যাসেট প্লেয়ার বেজে উঠল — পায়েল বাজে ঝম ঝম . . .

ছোট ভাইয়ের জন্যে সিগারেট কিনতে দোকানে যাবার মধ্যে এক ধরনের অপমান আছে। মন ছোট হয়ে যায়। কিন্তু উপায় কি? মোবারক জানে, সিগারেট কেনার মধ্যেই অপমানের শেষ না, আরো খানিকটা বাকি আছে। সিগারেট কেনার পর পঞ্চাশ টাকা থেকে দু'টাকা ফেরত আসবে। আবদুল করিম উদাস ভঙ্গিতে বলবে, টাকা ফেরত দিতে হবে না, রেখে দেন। তাকে দেখে দেখে লতিফাও শিখবে। সকালে বাজার করে আনার পর বলবে, বাড়তি পয়সা ফেরত দিতে হবে না, রেখে দেন।

তার টাকাপয়সার দরকার অবশ্যই আছে। এক-দুই টাকাও কম কিছু না। দুই টাকায় এক প্যাকেট আকিজ বিড়ি পাওয়া যায়। তারপরেও লজ্জা লাগে।

এই যে সে খালি গায়ে বসে আছে এটাও একটা লজ্জারই ব্যাপার। কখন না কখন ক্যামেরার সামনে নিয়ে যাবে তার জন্য সকাল থেকে খালি গায়ে বসে থাকার দরকার কি? এমন তো না যে তার শার্ট খুলতে এক ঘণ্টা লাগে। বলবে আর সে ফট করে খুলে ফেলবে। অনেক বেলা হয়েছে। খিদে জানান দিচ্ছে। এক জায়গায় বসে থাকলে খিদে বেশি লাগে। কাজের মধ্যে থাকলে খিদেটা ভুলে থাকা যায়। কাজ আর কোথায়? মোবারকের মনে হচ্ছে সিনেমা লাইনের একমাত্র কাজই হল বসে থাকা। বেশিরভাগ মানুষই বসে আছে। পুতুলের মত লাল টুকটুক মেয়েটাও তার মতই সকাল থেকে চেয়ারে বসা। এরা মনে হয় এক ফাঁকে খেয়ে এসেছে। অনেকের মুখেই পান। পুতুল-পুতুল মেয়েটাও পান খাচ্ছে। পান খাওয়ার জন্যে তার জিভটা লাল হবে কি না কে জানে। এক ফাঁকে দেখতে হবে। মেয়েটার নাম এখন মোবারক জানে। নাম হল কুমকুম। মেয়েটার স্বামী তাকে আদর করে কি ডাকবে — 'কুম'? মোবারকের ডান হাতের কাটা পড়ে যাওয়া আঙুল চুলকাচ্ছে। কোন একজন ডাক্তারের সঙ্গে ব্যাপারটা

নিয়ে আলাপ করলে হয়। পাড়ার সতীশ ডাক্তার আছে, এলএমএফ হলেও ভাল ডাক্তার। এম বি ডাক্তারের চেয়ে ভাল। তাকে বললে সে কি চুলকানির কোন ট্যাবলেট-ফ্যাবলেট দেবে? সতীশ ডাক্তারের সঙ্গে তার আলাপ আছে। রাস্তায় দেখা হলে জিজ্ঞেস করেন — কি মোবারক, খবর কি? তোমার ভাইয়ের এসিডিটি কমেছে? ভাজা-পোড়া কম খেতে বলবে। মোবারক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলে — জ্বি আচ্ছা বলব। যদিও সে ভালমতই জানে বলার প্রশ্নই আসে না। সব ছোট ভাইদের উপদেশ দেয়া যায় না। কিছু কিছু ছোট ভাই আছে, যাদের কাছ থেকে শুধু উপদেশ শুনতে হয়। কিছু কিছু ছোট ভাই আছে যাদের তুমি করে বলতেও অস্বস্তি লাগে। মোবারক তো একবার আপনি বলেই ফেলেছিল। কি লজ্জার ব্যাপার! তবে আবদুল করিম অন্যমনস্ক ছিল বলে বুঝতে পারেনি। হয়েছে কি, আবদুল করিম ইউরিন টেস্ট করাবে। পেচ্ছাব ভর্তি শিশি মোবারকের হাতে দিলে বলল, সাবধানে নিয়ে যান। রাস্তায় যেন না ভাঙে। মোবারক ঘাড় কাত করে বলল, জ্বি আচ্ছা। ছোট ভাইকে আপনি করে বলা লোকে শুনলে ছিঃ ছিঃ করবে। তবে দিনে দিনে অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তাতে মনে হয় খুব শিগগিরই সে আপনি বলা শুরু করবে। কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে। বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে গেলে কেমন হয়? বিছানা-বালিশ নিয়ে হাঁটা দেয়া? কিছু ব্যবস্থা কি আর হবে না? রেল স্টেশনে গিয়ে শুয়ে থাকা যায়। সরকারি জায়গা, কারো কিছু বলার নেই। তবে লোক জানাজানি হবে। তাতে আবদুল করিমেরই অপমান। নিজের ছোট ভাই, তার অপমান হতে দেয়া যায় না। ভাই তেমন খারাপ কিছুও না। তিন বছর ধরে তো তার ঘাড়ে বসেই খাচ্ছে। এখনো তো বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি। দু'জনের আলাদা সংসারের কত মজা। মোবারকের কারণে তাদের সেই মজা হচ্ছে না। ওদের দিকটাও তো দেখতে হবে।

রাত দশটার পর থেকে ক্ষুধায় মোবারক চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। তার মনে হচ্ছে গত কয়েক বছরে এমন খিদে তার লাগেনি। খিদের চোটে মাথার ভেতরে পর্যন্ত ভোঁ ভোঁ শব্দ হচ্ছে। তার পাশে রাখা সবুজ শার্টটায় কেউ লবণ মাখিয়ে দিলে সে সব্জি মনে করে খেয়ে ফেলতে পারে এমন অবস্থা। লাল টুকটুক মেয়েটাও চলে গেছে। মোবারকের অংশটা কখন হবে সে বুঝতে পারছে না। ডাইরেক্টার সাহেব একবার কিছুক্ষণের জন্যে তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে ইচ্ছা করলে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারত। সাহসে কুলায়নি, কারণ তাঁকে দেখাচ্ছিল পাগলের মত। তাঁর নাকি প্রেশারের সমস্যা আছে। কিছুক্ষণ আগে মাথায় পানি ঢেলেছেন। চুল বেয়ে এখনো ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। চোখ লাল। এরকম অবস্থায় কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না।

মোবারকের বাথরুমও পেয়েছে। মনে হচ্ছে পেতলের বড় কলসিতে এক কলসি পানি পেটে জমা হয়েছে। জায়গা ছেড়ে যেতে সাহসে কুলাচ্ছে না। কখন তার ডাক পড়বে কিছু বলা তো যায় না। বারশ' টাকা নগদানগদি পাওয়ার কথা। যে তাকে এনে দিয়েছে সে তাই বলেছে। বারশ' টাকা পেলেও দুশ' টাকা তাকে কমিশন দিতে হবে।

হাতে থাকবে এক হাজার, সেটাও কম কি? একটা লোক সারাদিন মাটি কেটে পায় ষাট টাকা। আর সে 'আঁ' বলে একটা চিৎকার দিয়ে পাবে বারশ' টাকা। বিশ্বাস হতে চায় না। তবে ফিল্মের সব ব্যাপারই তো অবিশ্বাস্য। হতেও পারে। দেখা যাক। টাকাটা পেলে লতিফাকে একটা শাড়ি কিনে দিতে হবে। বিয়েতে কিছু দেয়নি অথচ সে হল ভাসুর। হাজারখানিক টাকায় সোনার কিছু পেলে তাই দিত। শাড়ি তো আর থাকবে না। সোনাটা থাকবে। নিজের মেয়েদের গল্প করতে পারবে — এটা আমার ভাসুর দিয়েছেন। মেয়েরা এই জাতীয় গল্প করতে খুব পছন্দ করে। কোন্ গয়না কে দিয়েছে এটা তাদের একশ' বছর পরেও মনে থাকে।

রাত সাড়ে বারটার সময় ডাইরেক্টার সাহেব তার কাছে এসে বললেন, কি যেন নাম তোমার?

'স্যার মোবারক।'

'শোন মোবারক, তোমার অংশটা আজ হচ্ছে না।'

'কবে হবে স্যার?'

'বলা যাচ্ছে না। নাও হতে পারে। বিগ স্ক্রিনে আঙুল কাটাকাটি ভাল লাগবে না। যাই হোক, তুমি তোমার ঠিকানা রেখে যাও। প্রয়োজনে খবর দিব। প্রডাকশনের কে আছে এখানে? মোবারককে রিকশা ভাড়া দিয়ে দে।'

স্টুডিওর গেট থেকে বেরুতে বেরুতে একটা বেজে গেল। টাউন সার্ভিস বন্ধ। হেঁটে বাসায় ফেরা ছাড়া উপায় নেই। রিকশা ভাড়া পাওয়া যায়নি। যার দেবার কথা সে গম্ভীর মুখে বলেছে, সব বড় নোট। ভাংতি নাই। আরেক দিন এসে রিকশা ভাড়া নিয়ে যাবেন।

মোবারকের পকেটে দু'টা মাত্র টাকা। হাঁটা ছাড়া উপায় কি? প্রায় চার মাইল পথ। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত তিনটা। এত রাতে ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে না। আবদুল করিমের আবার ঘুমের অনেক নিয়ম-কানুন আছে। একবার ঘুম ভাঙলে আর ঘুম আসে না। রাত তিনটায় বাড়ি ফেরাটা সে কিভাবে নেবে সেটাও একটা কথা। রেল স্টেশনে রাতটা কাটিয়ে ভোরবেলা বাড়ি ফেরাই সবচেয়ে ভাল। কিন্তু খিদেটা অসম্ভব কষ্ট দিচ্ছে। বাসায় ফিরে চারটা ভাত না খেলেই না। লতিফা ঠাণ্ডা কড়কড়া ভাত দেবে না। ভাত তরকারি সব গরম করবে। লেবু থাকলে লেবু কেটে দেবে। একবার সে কাঁচামরিচ চেয়েছিল। ঘরে কাঁচামরিচ ছিল না। সে শুকনো মরিচ পুড়িয়ে তেল দিয়ে মেখে দিয়েছে। এতটা কোন মেয়ে করে না। লতিফা করে। তার জন্যে শাড়িটা কেনা গেল না। এটা একটা আফসোস।

গেটের সামনে এসে মোবারক অবাক। বারান্দায় বাতি জ্বলছে। আবদুল করিম বসে আছে বারান্দায়। তার পাশে লতিফা। মোবারককে দেখে আবদুল করিম কিছু বলল না। উঠে ভেতরে চলে গেল। লতিফা বলল, আপনি কোথায় ছিলেন ভাইজান? সে চিন্তায় চিন্তায় অস্থির। দুশ্চিন্তা করলে তার হাঁপানির টান উঠে। আমি তো আর

সেটা জানি না। রাত একটা থেকে হাঁপানির টান উঠেছে। বারান্দায় বসে বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। আমি ভয়ে অস্থির।

মোবারক লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল।

লতিফা বলল, ভাত খেয়ে এসেছেন?

'না।'

'হাত-মুখ ধুয়ে আসেন ভাত দেই। কোথায় ছিলেন বলেন তো!'

ভাত খাওয়ার সময় লতিফা সামনে থাকে। আজ নেই। না থাকলেই ভাল। আরাম করে খাওয়া যায়। অন্যের সামনে বিশ্রী ভঙ্গিতে দু'আঙুলে নলা করে ভাত মুখে তুলতে ভাল লাগে না।

হাত ধোয়ার সময় লতিফা শুকনো মুখে সামনে দাঁড়াল।

'ভাইজান, ওর হাঁপানির টানটা তো কমছে না। কেমন কেমন করে যেন শ্বাস নিচ্ছে। আমার তো খুব ভয় লাগছে। আপনি একটু এসে দেখে যান।'

'আসতেছি। তুমি কোন চিন্তা করবা না। ওর এইটা পুরানা অসুখ। ছোটবেলা কত হয়েছে। একবার হল কি, ইস্কুলের কিছু দুষ্ট ছেলে আমাকে ধরে খুব মার দিল। নাক দিয়ে রক্ত-টক্ত বের হয়ে বিশ্রী অবস্থা। তাই দেখে করিমের হাপানির টান উঠে গেল। এখন-তখন অবস্থা, তাকে নিয়ে গেলাম সদর হাসপাতালে। চিন্তা কর অবস্থা! ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তের বন্ধন তো। এই কারণে এরকম হয়।'

আবদুল করিমের অবস্থা আসলেই খারাপ। শোঁ শোঁ শব্দ করে শ্বাস নিচ্ছে। মোবারককে দেখে সে চিঁ চিঁ করে ডাকল — ভাইজান!

মোবারক বলল, কথা বলিস না। চুপ করে শুয়ে থাক। আমি সতীশ ডাক্তারকে নিয়ে আসি।

অনেকদিন পর ভাইকে তুই বলল। তুই বলতে গিয়ে তার গলা ব্যথা করতে লাগল।

রাস্তাঘাট ফাঁকা। ফাঁকা রাস্তায় মোবারক এগুচ্ছে। তার কাটা আঙুলের চুলকানিটা এখন নেই। সতীশ ডাক্তারের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে হয়। বড়ই রহস্যময় ব্যাপার। জগৎটাই রহস্যময়।

এই অঞ্চলের সবকটা স্ট্রিট লাইট নষ্ট। শেষ রাতের চাঁদের আলোয় চারদিক আবছ আবছা দেখাচ্ছে। 'কলঙ্ক ভরা চাঁদের আলো এত সুন্দর কেন?' এই ধরনের উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক চিন্তা করতে করতে মোবারক লম্বা লম্বা পা ফেলছে। দার্শনিক চিন্তার কারণেই বোধহয় তার চোখ একটু পরপরই জলে ভিজে যাচ্ছে।